সঙ্গীত জগৎ

অঞ্জন কুন্ডু

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৭৫

প্রকাশক
সংস্কৃতি
৫৮/৫১, প্রিন্স আনওয়ার সাহ রোড
কলিকাতা-৪৫

মুদ্রক
সাক্ষর মুদ্রণী
১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ফটোগ্রাফ
ফ্লাড লাইট স্টুডিও
আলোছায়া স্টুডিও

॥ আমার কৈফিয়ৎ ॥

সঙ্গীত জগতে চলার পথ কুসুমস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকাকীর্ণ। কত শিল্পী এসেছে কত কেউ চলে গেছে। কেউ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কেউ বা পায়নি। কেউ পেয়েছে সাফল্যের জয়মাল্য, কেউ বা হতাশার মরুপথে হারিয়ে গেছে। কেউ বা শুকতারার মত আকাশে জ্বলছে। কেউ বা খসে পড়া তারার মত স্মরণের আড়ালে বিলীন হয়েছে। সঙ্গীত জগতের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে খুব অল্প সংখ্যক শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞই সাফল্যের জয়মুকুট পরার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু যে বেশীরভাগ শিল্পীর একনিষ্ঠ সাধনায় ও অনাবিল আত্মত্যাগে যুগের সঙ্গীতের ও শিল্পসাধনার ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয়েছে, যুগ যুগ ধরে মানুষের সাংস্কৃতিক রুচিকে যাঁরা অধিকতর সুরুচিসম্পন্ন করার সেবায় আত্মনিয়োগ করে অপরিসীম দারিদ্র্য লাঞ্ছনা ও অবহেলা সহ্য করে মানুষজনের মনোরঞ্জন করে গেছেন। জাতি ও সমাজকে গড়ে তুলেছেন। আগামী যুগের সঙ্গীত জগতের ইতিহাস লেখার সময় তাঁদের কথা যাতে সংগ্রহকারীদের মনে পড়ে তার জন্যই আমার এই প্রয়াস।

আজো কত প্রতিভা বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করছে। উপযুক্ত লালনপালনের অভাবে অঙ্কুরেই তাঁদের বিনষ্ট হতে হচ্ছে। যদিও নামে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে সঙ্গীত শিল্পী, কিন্তু আজো শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনের বা তাঁদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার কোন ইঙ্গিত নেই—না আছে তাঁদের ভবিষ্যৎ, না আছে শেষ জীবনে কোন শান্তি বা স্বস্তির আশ্বাস। তাই আজো তাঁদের জীবন শিল্পসৃষ্টির মাঝেই সীমাবদ্ধ। যতদিন জনমানসে তাঁদের সৃষ্টি সমাদৃত হবে ততদিনই তাঁদের জীবন, আর জৌলুস ফুরানোর মাঝেই মৃত্যু বা অবসান।

কিন্তু এদেশে সঙ্গীত সাধনার বা শিল্পসৃষ্টির বিকাশের পথও নানাকারণে আজো রুদ্ধ। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও সহজ প্রবেশাধিকার নেই। যার ফলে অনেক তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ সে সুযোগ পেতে পেতে যৌবন খুইয়েও হতাশ হয়ে ফুরিয়ে গেছে। যে কজন এই রুদ্ধদ্বার ঠেলে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাঁদের

সংখ্যা একান্তই নগণ্য। অন্যান্য পদ্ধতির কথা নাই বা তুললাম, তাতে সঙ্গীত জগৎ ব্যাহত হওয়া ছাড়া মর্যাদা সম্পন্ন আর হচ্ছে কৈ! তবু সাধনার শেষ নেই, উচ্চাকাঙ্খার শেষ নেই। নব নব রচনার শেষ নেই। নানান সঙ্কীর্ণতা, বাধা-বিপত্তি, স্বজন পোষণ, উমেদারী সৃষ্টির প্রেরণাকে, তাড়নাকে, চেতনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। দিকে দিকে, জনে জনে, মনে মনে তারই শপথ আমি দেখেছি। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছি হতাশার বেদনাদায়ক ছবি, অন্যদিকে বাঁধভাঙা প্রত্যয়ের শুভেচ্ছাপূর্ণ অঙ্গীকার। সঙ্গীত জগতের একজন দীনসাধক হিসেবে আমার এ প্রচেষ্টা কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করলে আমি ধন্য হবো এবং এর সাধনায় আরো অধিকতর আত্মনিয়োগে ব্রতী হবো।

অঞ্জন কুণ্ডু

১নং গোপাল নগর রোড
পোঃ—আলিপুর
কলিকাতা—২৭

ঈশান দালাল রোড
পোঃ—বসিরহাট
২৪ পরগণা
ফোন—বসিরহাট-৭৮

সূচীপত্র

গীতি গুচ্ছ-র সূচীপত্র শেষ পৃষ্ঠায়



ঘরোয়া পরিবেশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত জীবন নিয়ে গভীর আলোচনারত লেখক অঞ্জন কুণ্ডু।



ঝটিকা প্রবাহের মত এলেন বম্বে থেকে মান্না দে। কলকাতায় রাশি কাজের মাঝখানেও তিনি লেখককে গান শোনালেন এবং তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করলেন।



সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে লেখককে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।



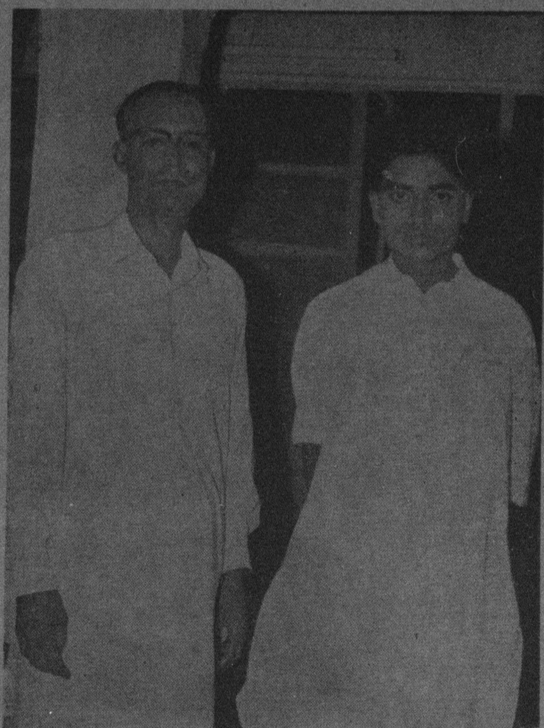
লেখক একাগ্রচিত্তে আলোচনারত সস্ত্রীক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও ললিতা ঘোষের সঙ্গে।



গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (গুপ্ত) লেখকের কাগজে তাঁর জীবনী লেখার পর স্বাক্ষর দিচ্ছেন।



লেখকের সঙ্গে সঙ্গীত প্রযোজনার বিভিন্ন দিক নিয়ে



লেখকের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতগুরু উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।



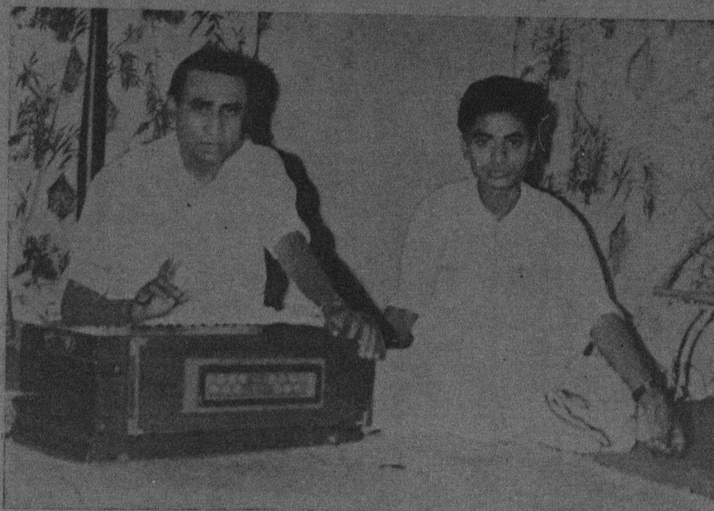
এক মনোরম পরিবেশে লেখক তন্ময় হয়ে গান শুনছেন
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।



সবে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুরমণ্ডল নিয়ে বসেছেন
সেই সময় লেখককেও তাঁর পাশে দেখা যাচ্ছে।



উৎপলা সেনের দুই যুগের কাহিনী শুনছেন অঞ্জন কুণ্ডু।



এ এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত—লেখক তাঁর সঙ্গীতগুরু দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের তালিম নিচ্ছেন।



খ্যাতনামা সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের জীবনী লিখছেন লেখক।



এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রখ্যাত শিল্পী সুবীর সেন পিয়ানো বাজাতে বাজাতে উঠে এলেন অঞ্জন কুণ্ডুর সঙ্গে আলাপ করতে।



প্রখ্যাত সুরকার প্রবীর মজুমদার শৈলেন মুখোপাধ্যায়কে একটি গানের Composition বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সেই সময় লেখকও হঠাৎ সেখানে উপস্থিত।



গোপাল দাশগুপ্ত লেখকের সঙ্গে আধুনিক গান ও রাগপ্রধান গান গাইবার কোন বিশেষ পদ্ধতি আছে কিনা এই নিয়ে আলোচনা করছেন।



এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে লেখকের সঙ্গে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।



বিমান ঘোষের সঙ্গীত জীবন শুনে লেখক বিস্ময়ে
তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।



দুই ছোটবেলাকার বন্ধু অনল চট্টোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
লেখকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। (লেখকের ডান দিক থেকে)



লেখক অঞ্জন কুণ্ডুর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে
শ্যামল মিত্র।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

"আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম
আমার ঠিকানা।
আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম
এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম
আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণীর কাছে
রাখলাম নিশানা॥"

এমন দুর্জ্জয় প্রত্যয় বুঝি বা বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে তথা জীবনেই মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে। দীর্ঘকাল বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে এমন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রতিভাত হয়েছে কিনা জানিনা, যিনি একাধারে সকল রকমের রসের, সুরের এবং অভিব্যক্তির সমন্বয় সাধন করেছেন। কি রবীন্দ্র সঙ্গীত, কি কাব্য সঙ্গীত, কি রাগাশ্রয়ী গান, ছড়া গান, লোকগীতি, আধুনিক গান, স্বদেশী, হিন্দী গান, গীত, ভজন, পাশ্চাত্য সুরাশ্রয়ী গান, কাহিনী গান, সর্ববিষয়ে এমন পারদর্শিতা, প্রতিটি বিষয়ের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পুরো মাত্রায় বজায় রেখে এমন সফলকাম শিল্পী সত্যই দুর্লভ। এই দরদী শিল্পীর গানে সত্যই যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে বিস্ময়বোধ না করে থাকতে পারে না কেউ। তাঁর "রাণার" শুন্‌তে শুন্‌তে সত্যিকারের গ্রামের ডাকহরকরার সুখ দুঃখময় জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হয়; আবার "গাঁয়ের বধূর" সজল উপাখ্যানে বাংলার এক কলঙ্কময় অধ্যায় মনে পড়ে যায়। "পাল্কীর গানে" প্রাচীন বাংলার সেই হুঁ-হুঁ-হুঁ-না আর গ্রামীন শস্য-শ্যামল বাংলার মনোরম দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। আবার সেই কণ্ঠ উদাত্ত আহ্বান দেয়

"অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি" কখনো বা তাঁর গানে প্রতিভাত হয় ধানকাটার গানের আনন্দ, কখনো বা মাঝি-মাল্লাদের দাঁড় বাওয়ার হেঁইও হো-হো হেঁইও। জনসাধারণের মনের কথা, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর কণ্ঠে যেন সত্যই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আবার দরদীকণ্ঠে কাব্যেরও যেন সীমা নেই—"প্রিয়ার লেখনী তরে হে বলাকা" "শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়" "যতদিন তারা জ্বলিবে সুদূর নভে" "অলির কথা শুনে বকুল হাসে" "আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে" "মেঘ কালো আঁধার কালো" "তার আর পর নেই" "মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে" "আমার জীবন যেন একটি খাতা" "বন্ধু তোমার পথের সাথীকে" "হাজার বছর ধরে কত নদী প্রান্তর" "পথ হারাবো বলেই এবার" আরো শত শত গানে তাঁর কণ্ঠ কাব্যরস পিপাসুদের মুগ্ধ করে আসছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষ করে "প্রেম" ও "স্বদেশী" পর্যায়ের গানই যেন তাঁর গলায় স্বকীয়তা প্রদর্শন করে, তারপরেই আছে "প্রকৃতি" ও "পূজা" পর্য্যায়। এককথায় যে কোন পর্য্যায়ের গানই যেন তার স্বকীয়তা নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠে। লোক সঙ্গীতের সুরাশ্রয়ী গান যেমন "ধিন্ কেটে ধিন্" "ও বন্ধু, এই বকুলঝরা" ছড়া গান—"ধিতাং ধিতাং বোলে", নজরুলের গান, অতুলপ্রসাদী গান, সুরসাগরের গান, ভজন, গীত, বাংলা ও হিন্দী সিনেমার বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিভিন্ন ভাব ও রস সম্পূর্ণ অজস্র গান তিনি পরিবেশন করে বাংলা তথা ভারতের সমস্ত ধরণের রসপিপাসু শ্রোতার হৃদয় রঞ্জন করেছেন, মনে হয় বাংলার সঙ্গীত ইতিহাসে তাঁর মত শিল্পীর জুড়ি মেলা ভার এবং এবিষয়ে তিনি সকলের প্রশংসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহধন্য।

১৯২২ সালে বেনারসে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ১৯৩৭ সালে তিনি কলম্বিয়া কোম্পানীর আহ্বানে প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক স্বর্গীয় শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে প্রথম গান রেকর্ড

করেন (জানিতে যদি গো তুমি)। যদিও তিনি বহু বিচিত্র ধরণের গান বিশেষ করে আধুনিক গান গেয়েছেন, তবু একটি প্রশ্নের উত্তরে দ্বর্থহীন ভাষায় বললেন—"আধুনিক গান বলতে রবীন্দ্রনাথ যা ৫০ বছর আগে ভেবে গেছেন তা এখনও কেউ করতে পারিনি—রবীন্দ্র সঙ্গীত চিরদিনের।"

আজকের আধুনিক গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি নিঃসংশয়ে বললেন—

"প্রভাব সবসময় ভাল, আর ছায়াছবির ক্ষেত্রে ছবির পরিবেশ যদি পাশ্চাত্য ঘেষা হয় তাহলে সেই ছবির সুরও পাশ্চাত্য ঢং-এ হওয়া উচিত।"

সঙ্গীতশিল্পী ছাড়া তাঁর সঙ্গীত পরিচালক পরিচিতি নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই আশা করি। সঙ্গীত পরিচালকের কর্তব্য সম্পাদন করে তিনি সর্ব্বভারতীয় সম্মান বহুবার অর্জ্জন করেছেন। বর্তমানে তাঁর পরিচালনাধীনে বাংলা ছবি আছে "শুকসারী" "সুয়োরাণীর সাধ" "বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ" "পরিণীতা" "অদ্বিতীয়া" হিন্দীর মধ্যে "রাহ্‌গীর" "খামসী" ও "মজ্‌লি দিদি।"

কস্তুরী মৃগসম সুরের গন্ধ ঢেলে মন পাগল করা শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের স্বরলিপি সত্যই লেখা রবে প্রথম উষার বর্ণচ্ছটায়, নদীর কল্লোলে কল্লোলে এবং শত শত সঙ্গীত পিপাসুর অন্তরের গভীরে গভীরে ..... !

মান্না দে

বাংলার ছেলে মান্না দে
বাংলাই তাঁর ভাষা
তাইতো তাঁর বাংলা গানে
আছে বুকভরা আশা।
তামিল ছাড়া সব ভাষা তাঁর
কণ্ঠে পেয়েছে সুর
হিমালয় থেকে কুমারিকা আজ
সেই সুরে সুমধুর ॥

বাংলার জলবায়ু, বাংলার মাটির বাইরে থেকে প্রতি বছর পূজায় বাংলা গান রেকর্ড করে বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর দরদী কণ্ঠের গান। একদিকে যেমন হিন্দী গান এবং অন্যান্য গান। অন্য দিকে বাংলা গানকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করেছেন, বাংলা গানকে ভাল বেসেছেন। তিনি যে একাগ্রতায় ও ঐকান্তিক সাধনায় প্রমাণ করেছেন তিনি মনে প্রাণে একজন বাঙালী শিল্পী। তাই আজ আমরা সগর্বে ঘোষণা করি তাঁর নাম — মান্না দে। 'এন্টনী ফিরিঙ্গির' "আমি যে জলসাঘরে"·· গানই শুধু নয়,—আরও বহু বাংলা গান তাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠে সকলের মনোরঞ্জন করেছে। তাঁর গান শোনার জন্য বাংলা তথা ভারতের বহু সঙ্গীতপিপাসু মন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে, কখন আবার শুনবো সেই গান— "আমি যে জলসাঘরে" · Function-এ আজ সবারই মুখে এক কথা—কখন গাইবেন মান্না দে—মান্না দে— মান্না দে।

এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ১৯২০ সালের ১লা মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বড় ভাই প্রনব দে New Theaters-এর

Music director ছিলেন। তাঁর সেজ ভাই ডঃ প্রকাশ দে এবং ছোট ভাই প্রভাস দে বেতারশিল্পী আর ৺কৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁর ছোট কাকা। তাঁর প্রথম গানবাজনার হাতেখড়ি তাঁর কাকার কাছেই। তিনি দবীর খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন, অমন আলি খাঁর কাছেও কিছুদিন গান শেখেন। এছাড়া আব্দুর রমান খাঁ সাহেব এবং তুলসী দাস শর্ম্মার কাছেও কিছুদিন শেখেন, একথা ভাবতে অবাক লাগে তিনি এখনও একজন ছাত্র। বর্তমানে তিনি গোলাম মোস্তাফা খাঁর কাছে গান শিখছেন এবং Music is his life. তিনি Classic এবং Folk song বেশী ভালবাসেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি কলকাতার Scotish Church College এর ছাত্র ছিলেন।

১৯৪৯ সালে তিনি বম্বেতে চলে যান, এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে, হরিপ্রসন্ন দাস, হেমচাঁদ প্রকাশ, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীদের Assistant হিসেবে যোগ দেন। "গণেশ মহিমা" নামে একটি ধার্মিক ছবিতে কথা ছিল হেমচন্দ্র প্রকাশ মহাশয় সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। কিন্তু হেমবাবু হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় তাঁকেই সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিতে হয় এবং এ ছবির গানগুলি super hit হয়। ফলে বিভিন্ন Film producer-এর কাছ থেকে তাঁর কাছে সঙ্গীত পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ আসতে থাকে। এইভাবে দিকে দিকে জনমানসে মান্না দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। আর আজ সেই মান্না দে সকলের বিস্ময়।

তিনি Bombayর H. M. V-তে প্রথম "কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো," এই গানটি রেকর্ড করেন। তিনি তামিল ছাড়া ভারতীয় সমস্ত ভাষায় সঙ্গীতের রেকর্ড করেছেন।

তিনি বর্তমানে "চিরদিনের" "শেষ থেকে সুরু" "বিলম্বিত লয়" "বাঘিনী" "শুকসারী" "তিন অধ্যায়" "সাবরমতী" "কখনো মেঘ" "সজারুর কাঁটা" ও "তিন ভুবনের পারে" প্রভৃতি ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

সবশেষে আমি প্রশ্ন করলাম মান্নাবাবুকে—"আধুনিক গানের

উপর পাশ্চাত্য সুরের যে খুব বেশী প্রভাব দেখা যাচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার কি মতামত ?”

তিনি উত্তরে বললেন—“গানের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকলে অনেক সময় একঘেয়েমি ভাব এসে যায়। Western Musicএর মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে হবে। Richness of Indian Music world-এ সমাদৃত। তবে Western Musicএর Composition বা অর্কেষ্ট্রা বাজনা খুবই সুন্দর।”

বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক বিরাট শিল্পীর নাম শুধু রেডিওতে শুনেছিলাম, তাঁর দরদী কণ্ঠে যে সুর ঝরছে সেই সুরের সুরভিতে এতদিন মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু সেদিন তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে আরও মুগ্ধ হয়েছি—সঙ্গীত জগতের এক বিরাট কর্ণধার হয়েও তাঁর নেই কোন অহংকার, নেই কোন গর্ব। সাফল্যের জয় মুকুট তাঁকে পরিয়ে দিয়েছে শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষ নয় সুদূর প্রাচ্য আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইনডিজ, জেনেভা, ফিজি-আইল্যাণ্ড। সত্যই বিরাট প্রতিভার সান্নিধ্যে না গেলে বোঝা যায় না, চেনা যায় না তাকে।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আজ আর আমাদের সাংস্কৃতিক রুচিবোধ নেই। গানবাজনার অনুষ্ঠানে ভিড় করি প্রকৃত গান শুনে উপলব্ধি করার জন্য নয়, যাই সেখানে হুজুকে পড়ে। আমাদের রুচির বিকার হওয়ায় সঙ্গীত জগতে নেমে এসেছে এক করাল ছায়া যার নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক গুণী ব্যক্তিই সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। সেদিন গভীর দুঃখের সঙ্গে কথাগুলি বলছিলেন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। সত্যিই আমরা শুধু শিল্পীর কণ্ঠস্বরকেই চিনি, শিল্পীকে নয়। তাঁর জীবনী লিখতে লিখতে আমার লেখা গানের কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল—

শিল্পী জীবনের কত ব্যথা
    জানতে চায় না কেহ ধরণীপরে
সকলের মনে দিয়ে আনন্দ সুধা
    শিল্পী শুধুই সে যে কেঁদে কেঁদে মরে।
সিক্ত চোখের জলে গেঁথে
    শূন্য হৃদয় ভরে দিতে
ক্লান্তপাখির মত সব খুশী বিলিয়ে
    শিল্পী সে ফিরে আসে রিক্ত ঘরে॥

শিল্পীদের যতদিন কণ্ঠ থাকবে ততদিনই বোধ হয় আমরা তাঁদের পিছনে ছুটবো, ধূপের মত গন্ধ বিলায়ে যেদিন কণ্ঠস্বর চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে সেদিন আর আমরাও হয়ত তাঁদের খোঁজ নিতে যাব না। শুধু আমরা নই, পৃথিবীর সবাই যাবে ভুলে, এটাই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম। সত্যিই কি বিচিত্র এই জগৎ!

নিজের মনের তাগিদেই প্রথম জীবনে গানবাজনার সূচনা। তাঁর

তাগিদ ছিল মার্গ সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ সঙ্গীত জীবনে আসবেন কিন্তু উত্তর জীবনে প্রয়োজনের তাগিদেই সে ইচ্ছা পূরণ করতে হয়েছে। ১৯৪০ সাল থেকেই তাঁর সঙ্গীত জীবন শুরু। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের কাছে। আর আধুনিক গান কারুর কাছেই শেখেননি। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল মহাশয়ই তাঁর প্রকৃত গুরু।

তিনি প্রথম ছায়াছবির নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয় হন। জনসাধারণের কাছে প্রথম পরিচিতি এনে দেয়—"আলেয়া" আর "শহর থেকে দূরে" এই ছবি দুটির গানের মাধ্যমে। তারপর বহু ছবিতেই নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অদ্যাপি তা অব্যাহত আছে। বর্তমানে তিনি "আদ্যাশক্তি মহামায়া" "আঁধার সূর্য্য" "মা ছিন্নমস্তা" প্রভৃতি ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন।

ছায়াছবির বাইরে তাঁর বহু রেকর্ড জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি প্রথম রেকর্ড করেন—"যদি ভুলে যাও মোরে" ও "ছিল যে আঁখির আগে" Hindusthan Record Companyতে। এছাড়া "জলভরা কাঞ্চন কন্যা", "আমি যদি চাতকও হই", "বলেছিলো কি যেন নাম তার" "ঝনন ঝনন বাজে", "এইটুকু এই জীবনটাতে" "মহুয়ার চেয়ে আরো মিষ্টি" প্রভৃতি আরও বহু গান জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে।

সবশেষে আমি ধনঞ্জয়বাবুকে প্রশ্ন করলাম—"বর্তমান রাগ-প্রধান আর আধুনিক বাংলাগান সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

তিনি উত্তরে বললেন—"রাগপ্রধানের একটা স্বকীয়তা আছে। It is class by itself. অন্যান্য গান রাগরাগিণীর সুরে হোত, তা আজকাল কমে গেছে। যুগের হাওয়ায় পাশ্চাত্য সুর বাংলা গানের সঙ্গে মিলে গিয়ে রাগরাগিণীর ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করেছে, যে কারণে বর্তমান আধুনিক সঙ্গীতে গানের থেকেও বাদ্যের ঐক্যতান বেশী।"

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (গুপ্ত)

সঙ্গীত জগতে যার প্রাণমাতানো মনভরানো গানে আকাশ বাতাস চারিদিক মুখরিত, যার গান শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রোতা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে, দিকদিগন্তে যার গানের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ সেই গৌরবের অধিকারিণী বাংলার স্নেহধন্যা কন্যা গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ১৩৪০ সালে কলকাতার ঢাকুরিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গীতের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, দূর থেকে কোন গানের সুর ভেসে এলে ছোট্ট মেয়েটির হৃদয় সেদিন চঞ্চল হয়ে উঠত এবং সেই সুরে একাত্ম হয়ে গানের ভেলা অসীম সাগরে ভাসিয়ে দেবার প্রচেষ্টার স্বার্থক রূপ দেখা গেল তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে।

ইংরাজী ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনসাধারণের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সঙ্গীত প্রতি-যোগীতার মাধ্যমে। এই প্রতিযোগীতায় একটি মাত্র ভজন গান গেয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ-বছরেই তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে স্বর্গীয় কবি অজয় ভট্টাচার্য্যের লেখা দুখানি আধুনিক গান গেয়ে অনেকেরই উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গীত জীবনের অগ্রগতির পথ বুঝি এবার আরও প্রশস্ত হল। বাতায়ন খুলে দেখতে পেলেন যেন মেঘমুক্ত নীল আকাশ।

১৯৪৪ সালে তিনি প্রথম রেকর্ড করেন 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েসে' গিরিন চক্রবর্ত্তীর সুরে। তিনি সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযামিনী নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে ছয় বছর বিশেষ আগ্রহে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন সম্মেলনে, বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে ভূয়সী প্রশংসা পান। ১৯৪৬ সালে ন্যাশনাল মিউজিক

এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এক বিরাট সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীরাইচাঁদ বড়াল মহাশয় ছোট্ট মেয়েটিকে পুরস্কারগুলি দিতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হলেন। এই প্রতিযোগীতার অতগুলি পুরস্কার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জীবনে এনে দিলো আরো আলোর আশা আর সুরের নেশা। এ বছরই সঙ্গীত সম্মেলন থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযামিনী নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় ছাড়াও প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর কাছেও কিছুদিন শেখেন। লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীধ্রুবতারা যোশী ও শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছেও শিক্ষার্থী হিসাবে বেশ কিছুটা ঋণী।

১৯৪৯ সালে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা জীবনের একটি স্মরণীয় বছর। এ বছরেই ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর সান্নিধ্যে এলেন। একথা ভাবতে যেন অবাক লাগে তিনি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও একজন শিক্ষার্থী ছিলেন।

তিনি প্রথম রাইচাঁদ বড়াল সুরারোপিত ও শ্রীবিমল রায় পরিচালিত "অঞ্জন গড়" ছবিতে কণ্ঠ দান করেন। এরপর অসংখ্য বাংলা ছবি এবং বম্বে ও মাদ্রাজে কয়েকটি হিন্দী ছবিতে কণ্ঠদান করেন। বর্তমানে "চিরদিনের" "কমললতা" "বালুচরি" "শান্তি" "দাদু" "বউদি" "অপরিচিতা" প্রভৃতি ছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছায়াছবির বাইরে তাঁর অসংখ্য গান রেকর্ড হয়েছে এবং তার মধ্যে বেশীর ভাগই আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের হৃদয় জয় করেছে।

শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় ওস্তাদদের সমাবেশে যে সব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পরিবেশন করে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি একাধারে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী আবার অন্যধারে আধুনিক শিল্পী, আজও আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক গান

পরিবেশন করেন। দুই ধরণের সঙ্গীতই সমান পারঙ্গম খুব কম শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়। জন্মজন্মান্তরের সাধনারই বুঝি প্রকাশ তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যা প্রকৃতিকে করে তোলে চঞ্চল, শ্রোতার মনে জাগায় আলোড়ন আর হৃদয়ে আনে গভীর আবেগ।

এবার প্রশ্ন করলাম—"আধুনিক গানের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আপনার কি মতামত এবং আপনি কিভাবে আধুনিক সঙ্গীত জগতে এলেন ?"

সন্ধ্যাদি স্মিত হেসে উত্তর দিলেন—"আমার মতে আধুনিক গান গাইতে হলে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের Background থাকা চাই। গান শুনতে শুনতে দিনের পর দিন আমি নিজেকে পরীক্ষা করেছি। ধারাবাহিক ভাবে কারুর কাছে আধুনিক গান শিখিনি। তবে বিভিন্ন গান রেকর্ড করার আগে বহু Music Directorএর সান্নিধ্যে গিয়েছি। তাঁদের Trainingএ গান শিখতে শিখতে আমার অভিজ্ঞতাও বেড়েছে।"

সেদিন জানিনা কোন্ তিথি ছিল। আকাশের সন্ধ্যাতারার জ্যোতি শুধু দূর থেকেই যেমন দেখেছি—তেমনি গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান রেকর্ডে, বেতারে, জলসায় শুনেছি, মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। সেই দূরে জাজ্বল্যমান সন্ধ্যা তারার কাছে যাবার কল্পনা অবাস্তব হলেও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে যাবার কল্পনা অবাস্তব হতে পারে না। তাঁর সাক্ষাতে যে অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহার পেয়েছি, তা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন বেঁচে থাকবে।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

সঙ্গীত জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী আর অন্য ধারে প্রখ্যাত হারমোনিয়াম ও তবলা বাদক। একজীবনে এরকম বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনেই দেখা যায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁর গানের কথা ও সুরের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু তাই নয় বাংলা দেশের বহু শিল্পীকে তৈরী করার মূলে তাঁর অবদান যথেষ্ট।

তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি গানবাজনার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হন। তাঁর পরিবারেও গানবাজনার চর্চা ছিল। হারমোনিয়ামের আবিষ্কার বা তার নক্সা করেন তাঁর ঠাকুরদা। ঠাকুরদা এবং বাবার কাছ থেকে প্রথম গানবাজনার অনুপ্রেরণা পান। তিনি ৭ বৎসর বয়সে অল্পদিনের জন্য দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কাছে এবং পরে তাঁর শিষ্যদের কাছে পাখোয়াজ, তবলা, ঢোল প্রভৃতি শেখেন। তিনি টনিবাবুর কাছে তবলা এবং বিপিনবাবুর কাছে পাখোয়াজ শেখেন। এছাড়া তিনি প্রথমে আজীম খাঁ, এবং পরে মসীদ খাঁর কাছে দীর্ঘদীন শেখেন। ইনিই তাঁর প্রকৃত ওস্তাদ। কিছুদিন ফিরোজ খাঁর কাছেও তবলা শেখেন। তিনি উজির খাঁর পুত্র সগীর খাঁ, ও দবীর খাঁ মহাশয়ের কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরী শেখেন। ১৯৪০ সাল থেকেই তিনি বেতারে নিয়মিত গাইছেন। স্কুল কলেজে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক, সুরসাগর হিমাংশু দত্তের গানও বেতারে গেয়েছেন।

তিনি শুধু গানবাজনা চর্চা করেছেন তাই নয়, তিনি একজন ক্রিকেট, হকি, ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি Presidency

কলেজ থেকে B.A. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অনার্স সহ পাশ করেন তারপর Calcutta University-তে দুই বৎসর M. A. পড়েন। কিন্তু সেই সময় ফুটবল খেলতে গিয়ে চোখে আঘাত পান সেজন্য পরীক্ষায় বসতে পারেন নি।

১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষের বাইরে যে সাংস্কৃতিক দল যায় তার মধ্যে তিনি ছিলেন আর ছিলেন রবিশঙ্কর, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, পটবর্ধনজী ও কিষেণ মহারাজ। তিনি মস্কো, তাসখণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেছেন।

আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা গুরুজী, রাগ প্রধান বাংলা গানের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত ?"

প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে উৎকর্ষ দেখতে পাই, যেগুলি আকর্ষণ করে সেগুলিকে নিয়ে এবং বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে সেই সমস্ত অলংকারগুলি নিয়ে বাংলা গানের মধ্যে পরীক্ষা করা। এতে বাংলার ভাব, কাব্যরস, সাহিত্য অনুভূতি থাকবে আর তালে মানে রাগে উৎকর্ষ থাকবে। হিন্দুস্থানী আধুনিক গানের মধ্যে রাগ থাকলেও তাকে রাগপ্রধান বলা যায় না কারণ রাগপ্রধানের একটা আলাদা গায়কী আছে। শিল্পীর রাগের, তাল লয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই।

একথা হয়ত অনেকেই জানেন না যে তিনি তবলা হারমোনিয়াম ছাড়াও বেহালা, সেতার, এসরাজ, বাঁশী, গীটার বাজাতেন। তিনি আকাশবাণীতে classic গীটার বাজাতেন। শচীনদেব বর্মন, দিলীপ রায়এর সঙ্গেও গীটার বাজিয়েছেন। তাঁর গীটার বাজনা শুনে সঙ্গীতাচার্য শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁর গানের সুরে বহু হিন্দী গান সন্ধ্যা মুখার্জী, ললিতা ঘোষ এবং বাণী সরকার রাগপ্রধান গান গেয়েছেন। তিনি ছায়াছবিরও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় 'আঁধারে আলোতে' মানবেন্দ্র মুখার্জী, কানন দেবী গেয়েছেন 'আশা' ছবিতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আর 'যদু ভট্ট' ছবিতে

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন ও 'বসন্ত বাহার' ছবিতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বসন্ত বাহারে ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পী যাঁরা ছিলেন তারা হলেন বড়ে গুলাম আলী, আমীর খাঁ, হীরাবাঈ, এ কানন, মানিক বর্মা, বিসমিল্লা খাঁ, শান্তা প্রসাদ, কণ্ঠে মহারাজ, রোশন কুমারী ইত্যাদি।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা গুরুজী, ভারতীয় সঙ্গীতে যে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব পড়েছে তা কি ক্ষতিকর বলে মনে করেন?"

গুরুজী স্মিত হেসে বললেন—"হয়তো কোন ক্ষতি হয়নি। আজকের দিনে চারিদিকের দেয়াল খুলে গেছে। পাশ্চাত্য সুরের প্রভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের যদি একটি সুচারু রূপ নেয়, তাহলে ক্ষতি কি? যদি মৌলিকত্ব আধুনিক গানের মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে আমরা আর থাকব না।"

সবশেষে প্রশ্ন করলাম আমার শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত শিক্ষক মহাশয়কে—"আপনার সঙ্গীত জীবনে কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে কিনা?"

তিনি উত্তরে বললেন -"সঙ্গীতের সঙ্গে জীবনের আকস্মিক ঘটনার যে খুব গভীর যোগ আছে—তা জোর করে বলা যায় না। প্রেরণার জন্য আঘাতের অপেক্ষা রাখা চলে না। সকলের জীবনে কিছু না কিছু আঘাত অবচেতন ভাবে আসতে পারে। তবে সঙ্গীতের মধ্যে আনন্দই মস্ত বড় জিনিষ।"

তিনি উপনিষদের যে কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন সেইকথা বলে আলোচনা শেষ করলেন—"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি বিশ্বানি জায়ন্তে।"

গোপাল দাশগুপ্ত

সঙ্গীত জগতে গোপাল দাশগুপ্তের নাম বিশেষ পরিচিত। তাঁর বিরাট প্রতিভার আলো দেখতে পাই সঙ্গীতের আকাশে উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারার মত জ্বলছে। তাঁর বিভিন্ন রাগ সঙ্গীত, কীর্ত্তন, ভক্তি-মূলক, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্র গীতি, আধুনিক ও অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে যে বিরাট অভিজ্ঞতা আছে তার মূল্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। এ ছাড়া নিজের কথা ও সুরের যথার্থ মিলনে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সেজন্য তাঁর স্থান সঙ্গীত জগতে অনেকের ঊর্দ্ধে।

১৯১০ সালের ১৫ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে মা, বাবা গান গাইতেন। তাঁর মামা শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র রায় একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ছোট বেলায় গান বাজনায় হাতেখড়ি হয় তাঁর কাছেই। "আর্য সঙ্গীত সমিতির" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের কাছ থেকে গান বাজনায় যথেষ্ট উৎসাহ পান। পাঠ্যা-বস্থায় কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে স্বদেশী গান শেখান। এ ছাড়া তিনি ছোট বেলায় বাঁশী ও বেহালা বাজাতেন।

১৯২৯ সালে কলকাতায় পড়াকালীন তিনি রাণাঘাটের শ্রীনগেন দাস মহাশয়ের কাছে রাগ সঙ্গীতের তালিম নিতে যান। এরই মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা কিছুটা ব্যাহত হয়, তবে গানবাজনার চর্চা তিনি ছাড়েন নি। কলকাতা থেকেই তিনি ওকালতি পাশ করেন। তারপর চট্টগ্রামে District Bar এ join করেন।

শিল্পী ও সুরকার হিসাবে "Broadcast Company"র Recording এর ব্যাপারে তিনি Bombay যান এবং সেখানে কিছু গাম নিজকণ্ঠে রেকর্ড করেন। সেই সময় প্রথম Bombay

Radio Station এর আমন্ত্রণে প্রথম বাংলা রাগপ্রধান এবং কীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪১ সালে ঢাকা রেডিওতে চট্টগ্রাম থেকে গিয়ে খেয়ালে নিয়মিত শিল্পী হিসাবে গান প্রচার করেন। এই সময় যুদ্ধের ব্যাপারে চট্টগ্রামে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে যখন লোকজন অপসারিত হতে থাকে তখন ওকালতি ছেড়ে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। কিছুদিন পরেই Dacca Station এ সঙ্গীত প্রযোজক হিসাবে নিযুক্ত হন।

দেশবিভাগের ফলে ১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্ট Dacca station এর কাজে Resign করেন এবং ১৫ই আগষ্ট কলকাতায় চলে আসেন।

১৯৫৫ সালে কলকাতার বেতার কেন্দ্রে সহকারী সঙ্গীত প্রযোজক হিসাবে যোগদান করেন। সম্প্রতি তিনি আকাশবাণীর সঙ্গীত প্রযোজক হিসাবে কাজ করছেন।

ছোট বেলা থেকেই তাঁর গান লেখার এবং সুর দেওয়ার আগ্রহ এবং অভ্যাস ছিল। স্বর্গীয় শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীত শাস্ত্রীর প্রেরণায় সমস্ত রাগের বাংলা গান রচনা করার এক সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি অনেক রাগপ্রধান গান লিখেছেন কিন্তু নানা কারণে কাজটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

অন্যধরণের গানের মধ্যে আধুনিক, ভক্তিমূলক, দেশাত্মবোধক গান কিছু কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তার মধ্যে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে মানবেন্দ্র মুখার্জীর গাওয়া 'বন্ধু হে পরবাসী' এবং শ্যামল মিত্রের 'কাঙাল আঁখি কাজল হারা' এ ছাড়া 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' ও 'শপথ নিলাম' এই দুটি গান চীন আক্রমণের সময় লোকের মুখে মুখে বাংলা এবং বাংলার বাইরে শোনা গেছে। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জীর গাওয়া 'চাঁদ সুরজের মেলায় রে' একটি গান লোক সঙ্গীতের সুরে খুবই সার্থক হয়েছিল। তাঁর লেখা কিছু গীতিনাট্য বেতারে প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে 'অভিশাপ' ও 'সাবিত্রী' উল্লেখ-

যোগ্য। 'অভিশাপ' আকাশবাণীর National Program এ প্রচারিত হয়েছে। অন্যান্য মৌলিক রচনার মধ্যে 'মীরাবাঈ' নৃত্য-নাট্য খুবই সাফল্য অর্জন করেছিল। মস্কোর নৃত্যনাট্য, ব্যালের গান ও সঙ্গীত গোপালবাবুর তত্ত্বাবধানে কলকাতায় আকাশবাণীতে Record করা হয় এবং Americaয় অভিনীত King of dark chamber এর আবহ সঙ্গীতও গোপালবাবুকে দিয়ে কলকাতায় করানো হয়।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা গোপালবাবু, আধুনিক ও রাগপ্রধান গান গাইবার কি কোন বিশেষ পদ্ধতি আছে?"

তিনি বললেন—"আধুনিক গান ও রাগপ্রধান গানের পার্থক্য বিচারে প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আধুনিক গানের সংজ্ঞা। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক গানের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। কারণ এক কালে যা আধুনিক গান বলে বলা হয়েছিল তা আজকের দিনে অন্য নামে পরিচিত। কোথাও কবির নামে জড়িত। কোনক্ষেত্রে আজকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে, কিন্তু রাগপ্রধানের একটা সংজ্ঞা বুঝে নিতে পারি। যারা বাংলা গান ভালবাসেন তারাই সঙ্গীত ভালবাসেন এমন অনুমান সবসময় ঠিক নয়। কারণ গান এবং সঙ্গীতের মধ্যে একটি পার্থক্য থাকে। সঙ্গীতের মধ্যে আসল বস্তু যেটিকে আমরা রাগভাব বলি সেটি সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তাদের কাছেই রাগপ্রধান গানের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। "সুরের সঙ্গে কথার মিল" এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রাগের সঙ্গে কথার মিল বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা না হলেও বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞ চিরকাল বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বাঙালী কাব্যপ্রিয় এবং গান প্রিয়। কিন্তু বাঙালী যে সঙ্গীত প্রিয় তাও আমরা উপলব্ধি করেছি। সেইজন্যে দেখতে পাই কথাসর্বস্ব গান এবং রাগসর্বস্ব সঙ্গীত এ দুয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য মেনে নিয়ে—বাংলা দেশের গানে রাগপ্রধান ধারাটির প্রচলন হয়েছে। নানা রকম সুরের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আধুনিক গানের সঙ্গে রাগপ্রধান গানের

যে পার্থক্য খেয়াল গানের সঙ্গে রাগপ্রধান গানের ঠিক ততখানি পার্থক্য। এই আলোচনাটি সকলের জানা। তবু কথা ওঠে আধুনিক গান গাইতে গিয়ে রাগ সঙ্গীতের কোন আঙ্গিক ব্যবহারে আধুনিক গানের সত্বাটি সম্পূর্ণ বজায় থাকে কিনা। আমার ধারণায় কেবলমাত্র আঙ্গিকেই রাগভাব প্রকাশ হয় না। সুতরাং ছুই একটি স্বরগাম বা টুকরো তান যদি আধুনিকে ব্যবহার করা হয় তাতে গানের আধুনিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। যদি তাতে রাগ আড়ম্বরের বাহুল্য না থাকে। আর রাগপ্রধান গানের স্বরগাম কিংবা তানের ব্যবহার যে করতেই হবে এমন কোন অনুশাসন যুক্তিযুক্ত নয়। ছুটো গানেরই আঙ্গিকের ব্যবহার এবং পরিবেশনের রীতি নির্ভর করবে শিল্পীর রসানুভূতির ও মাত্রা বোধের উপর। একটিতে কথার সঙ্গে সুরের মিল আর একটিতে কাব্যের সঙ্গে রাগের সহযোগীতা। এ রাগ অবিমিশ্র কিংবা সবসময় শাস্ত্রীয় হবে তা নয়। রাগভাবটিই আসল। যারা স্বর্গতঃ গোলাম আলি খাঁর "আয়েনা বালম্" কিংবা "ওঁ তৎসৎ" গান শুনেছেন তারাই রাগপ্রধান গানের মূল্য সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করতে পারবেন।"

বিমান ঘোষ

সঙ্গীত জগতে বিমান ঘোষের নাম সবারই জানা, নতুন এবং পুরানো সমস্ত শিল্পীর প্রতি তাঁর উদার ব্যবহার তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। সেদিন আমিও তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি তাঁর সঙ্গীত জীবন শুনে। Radioর কর্ণধার হয়েও তাঁর নেই কোন খ্যাতির লোভ, নেই কোন অহংকার।

১৯১৭ সালে তিনি বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে সাহিত্য, অভিনয় ও গানবাজনার চর্চা ছিল। তাঁর পিতা আশুতোষ ঘোষ Advocate হলেও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর পিতা, বিশ্বনাথ রাও ও শিবসেবক মিশ্রের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করেন, 'সঙ্গীত সমাজের' একজন সদস্যও ছিলেন এবং তাঁর পিতার ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল।

তিনি নিজে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কাজী নজরুল ইসলাম, উমাপদ ভট্টাচার্য্য, অনিল ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তিনি Scotish Church College এর Music Competitionএ খেয়ালে প্রথম হন এবং ঐ কলেজ থেকেই B. A. পাশ করেন এবং Matric পরীক্ষায় স্কলারশিপ পান এবং B. A. তে Philosofyতে অনার্স পান। তিনি Lawও কিছুদিন পড়েছেন।

গানবাজনা ছাড়া 'সম্প্রতি' নামে সাপ্তাহিক কাগজে Radio department নিয়ে তিনি লিখতেন এবং এছাড়া College Magazineএ বহু লিখেছেন। তিনি শিল্পীদের যাতে কিছু উন্নতি হয় সেদিকে এখনও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। Radioর চাকরীকে শুধু সরকারী চাকরী হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে Radioর Officer হিসেবে যোগ দেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি আলাউদ্দিন খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রবিশংকর, গোলাম আলি খাঁ সাহেবের সংস্পর্শে আসেন এবং হরেন ঘোষের সংস্পর্শে এসে Stage Show করার অভিজ্ঞতা হয় এবং তিনি কিছুদিন তিমিরবরনের সংস্পর্শেও ছিলেন।

বিমানবাবুকে প্রশ্ন করলাম—"আপনি এককালে তো গানের সুর দিতেন এবং Radioতে গান করতেন। এখন আর করেন না কেন?"

তিনি উত্তরে বললেন—"বাংলা দেশে বহু প্রতিভাবান শিল্পীই জন্মেছে। কিন্তু আমি চেয়েছি কর্মী হিসেবে সার্থকতা পেতে।"

একথা যখন শুনলাম তখন বিস্ময়ে হতবাক হলাম, এ ধরণের মানুষ আজও আছেন যাঁর নেই কোন নাম প্রচারের ইচ্ছা। শুধু শিল্পীদের যাতে কিছু উন্নতি হয় সেটা করতে পারলেই তিনি খুশী হন।

তিনি উৎপলা সেন, তালাত মামুদ ও আরও বহু শিল্পীর গানের সুর দিয়েছেন। তিনি Radioতে আধুনিক, পল্লীগীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন এবং সঙ্গীত বিচিত্রা পরিচালনা করেছেন। তাঁর গানের কথা ও আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছে।

শিল্পীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে তিনি শুধু শিল্পীদের A glorious days দেখেন নি এবং তাদের অসহায় অবস্থাও দেখেছেন। তাদের সুখ দুঃখময় জীবনের প্রভাব তাঁর নিজের জীবনেও কিছুটা পড়েছে এবং সেটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি আরও বললেন "I have lost my Artist life" কিন্তু বহু শিল্পী ও সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"বর্তমানে আধুনিক গান সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য?"

তিনি বললেন—"নিশ্চয় আধুনিক গানের খুব দুরবস্থা। আধুনিক গানের যে Impression সেটা ক্ষণস্থায়ী হচ্ছে।

Powerful সুরকারের অভাব। এক কথায় আধুনিক গানের অবস্থা খুব টলমল। কারণ মনে রাখবার মত গান খুব কমই হচ্ছে। আধুনিক গান নিয়ে এত বেশী Experiment হচ্ছে যার ফলে নিজস্ব কোন গতি পাচ্ছে না। তবে আধুনিক গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব জোর করে নেওয়া ঠিক নয়। আমাদের দেশের মাটি, সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। সেটা প্রেরণা হিসেবে আসুক তবে অনুকরণ হিসেবে নয়।"

ছায়াছবির সঙ্গীত সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন—"ছায়াছবির সঙ্গীতে নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যদি ভজন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত কোন বইএর মধ্যে থাকে সেটা তো আর Film Music নয়। আমাদের দেশে এত সঙ্গীতের বৈচিত্র্য আছে যাতে বিদেশের মত Serious এবং light Music বলে কোন ভাগ নেই।"

তিনি প্রখ্যাত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দেব খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে নিজেই বলে গেছেন—"বিমান ঘোষকে বাংলা দেশ চায়।"

সন্তোষ সেনগুপ্ত

সঙ্গীত জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত। দীর্ঘদিন সঙ্গীত জগতে থেকে বহু সঙ্গীতরসিকের মনের অপূর্ণস্থান পূরণ করেছেন। আজও রেকর্ডে বিভিন্ন সঙ্গীত প্রযোজনার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। আপনারা একথা শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন যে ১৯৩৫ সাল থেকে অদ্যাবধি ১১৩ খানা রেকর্ড করেছেন তিনি এবং তন্মধ্যে বহু গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং সে গানগুলি দিন যাবে রাত পোহাবে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তবুও সকলের স্মরণে থাকবে।

তিনি ঢাকার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্কুল জীবন অতিবাহিত হয় জলপাইগুড়িতে আর কলেজ জীবন অতিবাহিত হয় কলকাতায়। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে B. A. পাশ করেন।

তিনি প্রথম বাবার কাছ থেকেই গানবাজনার অনুপ্রেরণা পান, আর প্রথম মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জুসাহেব মহাশয়ের কাছে ঠুংরী শেখেন। এছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও বেশ কিছুদিন গান শেখেন এবং তাঁর লেখা কয়েকটি গান সেই সময় রেকর্ডও করেন। তিনি প্রথম যুগে হিন্দী, ভজন, আধুনিক গান রেকর্ড করেছেন আর পরবর্তী কালে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই রেকর্ড করেন। ১৯৩৯ সালে প্রথম রবীন্দ্রনাথের "কেন বাজাও কাঁকন" গানটি রেকর্ড করেন এবং সবচেয়ে এ গানটি প্রসিদ্ধ হয়। আর আধুনিক গানের রেকর্ডের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়—"জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা।"

বর্তমানে তিনি H. M. V. এবং Columbiaর বাংলা, উড়িয়া এবং অসমিয়া রেকর্ডের প্রযোজক। ভারতবর্ষের সর্বত্র অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য নাট্য পরিবেশন করেছেন।

তিনি দেবকী বোসের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র Music director ছিলেন। এ ছাড়া গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গীতিনাট্য 'শ্যামা' 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' 'শাপমোচন' 'বাল্মিকী প্রতিভা' সম্পূর্ণ পরিচালনা করেছেন।

সবশেষে আমি প্রশ্ন করলাম সন্তোষ বাবুকে—"আধুনিক গানের মধ্যে পাশ্চাত্য সুরের যে প্রভাব দেখা যাচ্ছে, এ-সম্পর্কে আপনার কি মতামত ?"

প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"যুগের হাওয়ার সঙ্গে চলতে হবে সবাইকে। কাজেই পাশ্চাত্য সুরের যে প্রভাব আসছে তা আসবেই। বর্তমান আধুনিক সঙ্গীতে তার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।"

আমার লেখনি যখন শেষ হল তখন সূর্যদেব অস্তাচলের পথে। পশ্চিমদিক তখন অস্তরবির সোনালী আলোয় আলোকময়। পাখীরা আপন নীড়ে চলেছে ফিরে। তাঁর সান্নিধ্যে প্রথম থেকে শেষ ক্ষণটুকু সত্যিই সুন্দর, সত্যিই রমণীয়।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত কবি P. B. Shelly বলেছেন—"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." তাঁরই উক্তির সার্থক রূপায়ন বুঝি দেখা যাবে প্রখ্যাত শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবনে। আজ থেকে ১৫ বছর আগে "অগ্নিপরীক্ষা" ছবিতে শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'জীবন নদীর জোয়ার ভাটা' ও 'আর কবে দেখা দিবি মা' এই দুটি গান শুনেছিলাম। তারপর "হারানো প্রেম" ছবিতে 'নিবিড় আঁধারে' ও "কেদার রাজা" ছবিতে 'কে সজনী' গানও শুনেছি। কিন্তু যে জিনিষটা আমার চোখে পড়েছে সেটা হোল তাঁর Voice এর Maturity. দীর্ঘদিন সাধনার ফলেই এটা সম্ভব হয়। আজও সঙ্গীত সাধনাই তাঁর জীবনের মূল ব্রত।

আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি এখনও প্রতিদিন সকাল বেলায় ২ ঘণ্টা তানপুরা নিয়ে বসেন। তানপুরা নিয়ে কোনদিন বসতে না পারলে তাঁর মনে হয় যেন সঙ্গীত সাধনায় কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেল।

তিনি প্রথম ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে, তারপর একটানা গত ১৮ বছর প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শুধু জীবনে সঙ্গীতচর্চাই করেন নি সতীনাথবাবু, তিনি হুগলীর মহসিন কলেজ থেকে I. A. পাশ করেন প্রথম বিভাগে, এবং B. A. Distinction সহ উত্তীর্ণ হন।

আপনারা শিল্পী হিসাবে অনেকেই সতীনাথবাবুকে জানেন, কিন্তু সুরকার হিসাবে তাঁর দিকটা হয়ত অনেকেই জানেন না।

তাঁর নিজের সুরে অজস্র হিট-গান আছে। যেমন—"পাষাণের বুকে লিখোনা আমার নাম।" "আজ তুমি নেই বলে" "বালুকা বেলায় কুড়ায় ঝিনুক," "না যেওনা" "রাত জাগা মোর," "জীবনে যদি দীপ," "কে গো গাগরী ভরণে যায়," "দুটি জলে ভেজা চোখ," "এলাম শুধু সাগর তীরে," "আমার এ গানে," "সুখের পৃথিবী দিয়েছে ফিরায়ে মোরে।"

এছাড়া তাঁর নিজের সুরে "কোথা তুমি ঘনশ্যাম" "ওগো শ্যাম মিনতি তোমায়" "কেন জানিনা।" "ময়ুরী নাচে আজি নিঝুম রাতে জাগি", 'পথ চেয়ে রাধিকা রয়েছে জাগি' প্রভৃতি প্রত্যেকটি গানই শুদ্ধ রাগের উপর সুর করেছেন।

তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য গান হেমন্ত মুখার্জীর—"তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই," "আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে।" শ্যামল মিত্রের—"তুমি আর আমি শুধু" "এত আলো আর এত হাসি গান।" উৎপলা সেনের—"ঝিকমিক জোনাকি," "ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়," "দোলা দিয়ে যায় কে." "ঝুমকো লতার বনে," "মহুয়া বনে পাপিয়া," "বাজায়ানো মোহনবীণা," "আজ থেকে সেই অনেকদিনের পরে।" মানবেন্দ্র মুখার্জ্জীর—"তুমি ফিরায়ে দিয়েছো বলে," "ভুলে গেছি কবে," "আমার হৃদয় নিয়ে আর কতকাল বলো" "তোমার পথের প্রান্তে," লতা মঙ্গেশকরের—"কত নিশি গেছে," "আকাশ-প্রদীপ জ্বলে।" দ্বিজেন মুখার্জ্জীর—"যেদিন তোমায় আমি দেখেছি," "তুমি এলে কি," ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য—"শূণ্য ঘরে ফিরে এলাম যেই," "আমি চেয়েছি তোমায়।" সুপ্রীতি ঘোষের—"যেথায় গেলে হারায় শুধু" "এই বসন্ত জানালে বিদায়।" কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দী ভজন গান।

৺পান্নালাল ভট্টাচার্যের—"তোমার মত আমিও কত সয়েছি।" ৺দীপক মৈত্রের—"কত কথা হোল বলা," "এ তো নয় শুধু গান।"

সুধীন দাশগুপ্তের সুরে তিনি গেয়েছেন—"সোনার হাতে

সোনার কাঁকন," "বঁধুয়া আমার বুঝি এলো না" "বলেছিলে হবে দেখা," "সুন্দরী ললনা" ও নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে—"রাধিকা বিহনে কাঁদে।" এছাড়া বিখ্যাত দ্বৈতসঙ্গীত উৎপলা সেনের সঙ্গে—"রামা হো" হিন্দী গান।

আমরা হয়ত সতীনাথ বাবুর গান রেডিওতে শুনতে পেতাম না। কেন বলুন তো? জানেন কি? তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিনি Radioর Audition এ ৯ বার fail করেন এবং ১০ বারের বার পাশ করেন। Radioতে ৯ বার Auditionএ fail করেও তিনি বাড়িতে বসে থাকেননি। তিনি সেদিন রাতে ঠিক যেন একথাটাই বলতে চেয়েছিলেন আমার লেখা গানের ভাষায়—

চৈতালী ঘূর্ণী হাওয়ায়

আশা খেয়া যদি ডুবে যায়

দুঃস্বপ্নের সুরে এ হৃদয় ভরে নিয়ে

বিষাদের গান ওগো গেওনা।

সেই সতীনাথবাবুই বর্তমানে All India Radioর সকল Station থেকেই গজল, গীত পরিবেশন করেন এবং আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে লঘুসঙ্গীতে যেকজন বর্তমানে Highest fee পান সতীনাথবাবু তার মধ্যে একজন। একথা বলা বাহুল্য যে তিনি সঙ্গীত জগতে আসার পথে বাধা পেয়ে যদি মনোবল হারিয়ে ফেলতেন, সঙ্গীত জগতে নিঃসন্দেহে এক বিরাট প্রতিভার অঙ্কুরেই বিনাশ হবার সামিল হোত।

তিনি ছায়াছবির নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে "অগ্নি পরীক্ষা," "হারানো প্রেম," "কেদার রাজা" ছাড়াও "অতিথি" ছবিতে উৎপলা সেনের সঙ্গে 'মাঝে নদী বহেরে' আর "মায়াবিনী লেন" ছবিতে 'এ-বেলায় ভারি' গেয়েছেন। বর্তমানে তিনি "নল দময়ন্তি" ও ঋত্বিক ঘটকের—"রঙের গোলাম" ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে বাংলা সঙ্গীত জগতে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি পূর্বপাকিস্তানে ফরিদপুর জেলা, গ্রাম ট্যাঙরা, ইদিলপুর পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় লালমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রথম শিশু কালে এসরাজ এবং তবলা শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি সঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

পিতার মৃত্যু যখন হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বৎসর। সেই সময় তিনি স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র এবং এই সময় থেকে স্বর্গীয় বিপীন বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও ঠুংরী শিক্ষা লাভ করেন। শৈশব থেকে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল যেমন একদিকে, তেমনি তাঁর পড়াশুনার প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ১৯৪২ সালে বরিশাল টাউনে বি, এম, কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন।

১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। তারপর মাঝখানে নিজে নানাভাবে ১০ বৎসর সঙ্গীত চর্চ্চায় মগ্ন থাকেন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় এবং অদ্যাবধি তা অব্যাহত আছে। সত্যিই তিনি একনিষ্ঠ সাধক এবং শিল্পী।

কলকাতায় আসার পর থেকে তিনি ছোটখাটো অনেক আসরেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই চেতলায় অনুষ্ঠিত 'মুরারী সম্মেলনে' সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অনেক সম্মেলনেই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে

তিনি 'আকাশবাণী' তে সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পান, আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকেও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়া তিনি এলাহাবাদে বহু আসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

সেদিন কর্মমুখর কলকাতা মহানগরীর ঢাকুরিয়ার ১২০ সেলিমপুর রোডে উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে এক মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি শুনে লিখছিলাম। আমি প্রশ্ন করলাম—"প্রথম থেকেই নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত পথে যাত্রা করেছিলেন কিনা ?"

প্রশ্নের উত্তরে জানালেন—"না, প্রথমে নানা ধরণের 'রেকর্ড সঙ্গীত' অনুকরণ করে যেতাম। পরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই আত্মনিয়োগ করি।"

তারপর প্রশ্ন করলাম—"পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন রকম প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর পড়েছে কিনা এবং তা ক্ষতিকর কিনা ?"

উত্তরে জানালেন—"পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে যদি কিছু অজান্তে এসে যায় তো এসে যেতে পারে কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তৃতি এত অধিক যে ইহার সহিত কোন দেশের সঙ্গীত মিশ্রণ করে জনপ্রিয়তা বাড়াবার দরকার হয় না।"

"যতই জানা যায় জানবার অধিক প্রতীয়মান হয়" সত্যিই আমাদের অজানাকে জানতে হবে আর অচেনাকে চিনতে হবে। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রেও বুঝি জানার আর শেষ নেই। তাই তো আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় বললেন—"একজন্মে সাধনার শেষ হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের বহু রাস্তা এখন অনাবিষ্কৃত আছে। কাজেই নিরাশ হবার মত কিছু নেই। আর তা ছাড়া মানুষ, প্রকৃতি আর সঙ্গীতকে এক ভাবেই দেখতে হবে। আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং অভিজ্ঞতা সঙ্গীতময়। সুতরাং যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি রাখি তাহলে রাগরাগিণীর চরিত্র সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। কারণ প্রতি মাসের প্রতি

দিনের যে উত্তাপ তার মধ্যেই সঙ্গীত নিহিত আছে। উত্তাপের তারতম্যের জন্য রং এর পরিবর্তন হয় এবং তার স্থানেরও পরিবর্তন হয়। এইভাবে বিচার করে স্বরস্থানকে ঠিক করতে হয়। আন্দোলনের দ্বারাই শব্দের সৃষ্টি এবং এই আন্দোলনের তারতম্যের জন্য উত্তাপের পরিবর্তন হয়।"

শুধু বেতারে বা সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন তাই নয়, ছায়াছবির নেপথ্য শিল্পী হিসাবেও অংশগ্রহণ করেছেন। "সুরের আগুন" বইটিতে কোমল 'রে' যুক্ত আশাবরী এবং দেশী টোড়ী দুখানি গান রেকর্ড করেন।

অবশেষে 'Philosophy of your Music' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন—"গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গানের আওয়াজের সহিত তান, বোলতান এবং নানা অলংকারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করি। কারণ "Proportion is beauty." প্রতিটি রাগের তার নিজস্ব রূপ থাকা সত্ত্বেও ভাষা এবং তানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, সুতরাং প্রথমে ভাষার অর্থ জানতে হবে এবং কি রাগে রাগপ্রকাশে কোন্ ভাষা সবচেয়ে সাহায্যকারী সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

সত্যিই সেদিন আমার শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত শিক্ষক মহাশয়ের কাছে গিয়ে বারবার মনে পড়ছিল পুরানো দিনের কত কথা। ভাবতে ভারী ভাল লাগছিল, তাঁর কি চমৎকার সঙ্গীত শিক্ষাদানের পদ্ধতি। আর উদাহরণ সহযোগে গানের আরম্ভের পূর্বে গানটির অর্থ বুঝিয়ে দেয়া। আজও তিনি শিক্ষকতার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। বর্তমানে "বাণীচক্রে" মিউজিক এ্যাণ্ড ড্যান্স ট্রেনিং কলেজের একজন সঙ্গীত শিক্ষক। বর্তমানে বয়স ৪৭ বৎসর। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কি যেন এক যাদু আছে যা শুনে আজও সবাই মুগ্ধ।

শ্যামল মিত্র

"এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে
মন যেতে নাহি চায়
তবুও মরণ কেন
এখান থেকে ডেকে নিয়ে যায়
কে জানে কোথায় ?
না না না না যাবো না
মন যেতে নাহি চায়।"

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা শিল্পী শ্যামল মিত্রের দরদী কণ্ঠে যে সুর ঝরেছে তা আমাদের মনে রেখাপাত না করে পারে না। সত্যই সুন্দর এই পৃথিবী। আকাশে বাতাসে বিচিত্র পুষ্পের সুরভিতে শিল্পীদের মনমাতানো গানেতে মন সবারই হয়ে যায় দিশেহারা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" সুরকার ও শিল্পী শ্যামল মিত্রের প্রতিটি গানই বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে সুর করা এবং সেই গানের সুরের ঝরণার উপর পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলো আর রজনীগন্ধার গন্ধে শুধু আমরা মুগ্ধ, বিস্মিত, দিশেহারা নই—

নদীও বাঁধন হারা পেয়ে সে সুরের সাড়া
কুলু কুলু ছন্দ তুলে গাইছে গান !

১৯২৯ সালে ১৩ই জানুয়ারী তিনি তাঁর মামার বাড়ী চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তাঁর নৈহাটীতে কেটেছে। তিনি নৈহাটীর মহেন্দ্র হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। হুগলীর Govt. College থেকে I. Sc. পাশ করেন। তারপর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে B. Sc. পর্যন্ত পড়েন।

১৯৪৬ সালে তিনি মুরারী স্মৃতি সম্মেলনে গান শুনতে যান এবং সেখানে ৺সুধীর লাল চক্রবর্তীর গান শুনে তিনি তাঁর কাছেই তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সবরকম গান শেখেন এবং পরে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি প্রথম গান করেন কলকাতার আশুতোষ কলেজে এবং অনেক

বড় বড় শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল সেখানে। শ্যামলবাবুর একটি মাত্র গান করার কথা ছিল। কিন্তু জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে পরপর তিনখানা গান তাঁকে করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই জনসাধারণের কাছে প্রথম পরিচিতি এনে দেয়।

১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি বেতারে প্রবেশ করেন এবং ১৯৪৮ সালেই H. M. V. তে ৺সুধীর লাল চক্রবর্তীর সুরে পবিত্র মিত্রের কথায় "বন্ধু গো জানি" এই গানটি রেকর্ড করেছেন তারপর তিনি বহু রেকর্ড করেছেন। এবং যে গুলির প্রত্যেকটির প্রকাশ ভঙ্গী ভিন্ন।

শ্যামলবাবুকে প্রশ্ন করলাম—"গানের সুর করার কোন বিশেষ পদ্ধতি আছে কি না ?"

তিনি বললেন—"গানের সুর করার কোন বিশেষ পদ্ধতি নেই। তবে আমি যখন Filmএর গানের সুর করি তখন Filmএর সেই Situation মনে মনে ভেবে নিয়ে সুর করা শুরু করি। কোন ক্ষেত্রে কবি দরকার মত আগে গানের কথা দিয়ে দেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কবি গানের সুরের উপর কথা দিয়ে দেন।

তিনি ছায়া ছবিতে প্রায় ২০০ খানা বইতে কণ্ঠ দান করেছেন। বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষার মধ্যে যেসব ছবি আছে তার মধ্যে 'গড় নাসিমপুর' 'বিবাহ বিভ্রাট' 'দুরন্ত চড়াই' 'পদ্ম গোলাপ' 'সমান্তরাল' 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিষ্টান্ট' 'দৃষ্টি দর্পণ' প্রভৃতি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

সবশেষে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা শ্যামলবাবু, আধুনিক গানের শিক্ষাপদ্ধতি কি হওয়া উচিত ?"

তিনি উত্তরে বললেন—"যে কোন গান গাইতে হলে প্রথমে গলাকে Classic পদ্ধতিতে তৈরী করা উচিত। আধুনিক গানের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি যার যার নিজস্ব। তবে সব গানই একই পদ্ধতিতে করা উচিত নয়। যে রকম যে রকম গান হবে সেই ভাবেই আধুনিক গানের প্রকাশ হওয়া উচিত।"

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সঙ্গীতের দিক্‌পালদের মধ্যে অন্যতম প্রথিত যশা শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠে প্রতিটি রবীন্দ্র সঙ্গীতই অনবদ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সুরের ইন্দ্রজালে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন বলেই আজ দিকে-দিকে জনে-জনে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রশংসার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ আজ পৃথিবীর বিস্ময়। তাঁর গানের বিশেষ দিক আজ সবার চোখেই ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -'গানের ভিতর দিয়ে যখন ভুবনখানি দেখি তখন তারে চিনি, তখন তারে জানি।' আমাদের সেই গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভুবনকে জানতে হবে, চিনতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে যেসব প্রখ্যাত শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার চেষ্টা করছেন প্রখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় তার মধ্যে একজন।

১৯২৭ সালে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় অতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

তিনি বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম সবিতা মুখোপাধ্যায়। তাঁর বর্তমানে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রের নাম দেবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আর কন্যার নাম মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়।

তাঁর পরিবারে গানবাজনার চর্চা বরাবরই ছিল। তিনি প্রথম সুশান্ত লাহিড়ীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন। গানবাজনা ছাড়াও তিনি খেলাধূলা করতে খুব ভালবাসতেন এবং আজও তিনি কয়েকটি বিশেষ ক্লাবের সভ্যপদে জড়িত আছেন।

১৯৪৪ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর চাকরী

জীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯৫৪ সালে তাঁর চাকরীর অবসান হয়। তারপর তিনি মনের দুয়ার পুরোপুরি খুলে দেন সঙ্গীত জগতে।

১৯৪৬ সালে তিনি Radioতে প্রবেশ করেন। তবে একবারে Radioতে প্রবেশ করতে পারেননি। ৬বার Radioতে Audition দেবার পর ৭ বারের বার Radioতে প্রবেশ করেন। তিনি Radioতে প্রথম দিন রাত ৭-৩০ ও ১০-৩০টায় রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন যা খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই জুটেছে।

তাঁর প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড বের হয় Megaphone Company থেকে। তারপর H. M. V. তে প্রথম রেকর্ড করেন— "তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী।" তাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ডের মধ্যে বহুগানই জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—"তুমি কেমন করে," "জড়ায়ে আছে বাঁধা" "হার মানা হার," "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি," "ওই জানালার কাছে," "অনেক কথা যাও যে বলে" "গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে" আর ইদানীংকালে "ভরা থাক স্মৃতি সুধায়' "একদা তুমি প্রিয়ে।" ছায়াছবির মধ্যে "সন্ধ্যা রাগ" ছবিতে "বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা" "কাঁচের স্বর্গ" ছবিতে "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়" এবং "ক্ষুদিত পাষাণে"—"যে রাতে মোর" এই গানগুলি তাঁর শিল্পী জীবনে সাফল্যের জয়মাল্য পরিয়ে দেয়। এছাড়া "দুইনারী" ছবিতে তিনিই সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এবং বহু ছবিতে তিনি কণ্ঠদান করেছেন।

আধুনিক গানের মধ্যে তৎকালীন দিনে পরীক্ষামূলক গান হিসেবে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে "ভাঙা তরীর শুধু এ গান" ও "এই ছায়া ঘেরা" উল্লেখযোগ্য। তারপর অনেক গানই লোকের মুখে মুখে ফিরছে, তার মধ্যে উল্লেখ করা যায়—সলিল চৌধুরীর সুরে "পল্লবিণী গো," "একদিন ফিরে যাবো।" সত্যীনাথ মুখার্জীর সুরে— "যেদিন তোমায় আমি দেখেছি।" অভিজিৎ ব্যানার্জীর সুরে—

Folk style-এ "কপালে সিঁদুর সিঁদুর" "সাতনরী হার দেবো।" এছাড়া "হাজার মনের ভীরে" এ গানটিও নতুন ধরণের।

তাঁর কণ্ঠে সব চেয়ে রোমান্টিক গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—"তোমার প্রথম লেখা প্রেমলিপি" এবং Most Lyrical গান—"হাওয়া এসে খোঁপাটিকে।" আবার বৈষ্ণব কাব্য ও কীর্তনাঙ্গের প্রভাব নিয়ে এল —"ভেবেতো পাইনা ও মুখের সাথে কিসের তুলনা করি।" তারপর আরও পরীক্ষামূলক গান হিসেবে মাধবী মুখার্জীর সংলাপ সহ তাঁর গান—"চললাম, আর সময় নেই···· আমি ছিলাম আমি আছি।" (সংলাপ) এই রেকর্ডের উল্টোদিকে পুরো western ঘেষা গান—'যৌবন তরঙ্গে দেয় দোল কার অঙ্গে" এবং এ গানটির গাওয়ার পদ্ধতিও অত্যন্ত কঠিন।

তিনি বাংলা ছবি ছাড়া হিন্দী ছবিতে সলিল চৌধুরীর training-এ "মধুমতী" "মায়া" "হনিমুন" প্রভৃতিতে কণ্ঠদান করেন।

শিল্পী দ্বিজেন মুখার্জীর সঙ্গে পবিচয় আমার একদিনের নয়। আমি কিছুদিন তাঁর কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের তালিম নিতে যাই। প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে আজও আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর সান্নিধ্যে না গেলে বোঝা যায় না যে তিনি প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে কত আপন ভেবে গান শেখান। একথা আমি কোন দিনও ভুলতে পারবনা।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন করলাম—"রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য ?"

তিনি বললেন—"প্রথম রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করা। তাঁকে জানবার জন্য তাঁর বিভিন্ন বই পড়া, বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করা এবং তাঁর গানকে উপলব্ধি করা। যে কোন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর যথেষ্ট চিন্তা করে তাঁর ভাষাকে বোঝা দরকার এবং গানের গায়ক পদ্ধতি ও বিভিন্ন উচ্চারণ পদ্ধতি স্পষ্ট হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা যে সুর দিয়েছেন সেটা স্বরবিতান

অনুযায়ী ভাষাকে এবং সুরকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারলেই তাঁর প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

এটা খুবই আনন্দের কথা যেটা চিরন্তন সত্য সেটাই প্রকাশ পেয়েছে, প্রতিটি লোকের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বিশেষ দিক ধরা পড়েছে। আমার মতে রবীন্দ্রনাথের গান ভাল করে গাইতে হলে গীতবিতানের প্রথম খণ্ড 'পূজা'র গানগুলি বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ এবং পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ। দুজনের মিশ্র হয়েছে এই 'পূজা'র গানেতে।

প্রশ্ন করলাম—"আধুনিক গানে বর্তমানে Lyricএর সাহিত্য-মূল্য সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?"

তিনি উত্তর দিলেন—"আধুনিক গানে ৮।১০ বছর আগে গানের ভিতরে সাহিত্যের যথেষ্ট রূপ প্রতিফলিত হোত বিশেষ বিশেষ গীতিকারদের মাধ্যমে। ইদানীংকালে বিশেষ বিশেষ গীতিকাররাও কিছু কিছু গান লিখেছেন। কিন্তু সে রূপটা ইদানীংকালে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

এবার সবশেষে তাঁর সঙ্গীত জীবনের এক চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলছি।—

এককালে খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন শ্রীসত্য চৌধুরী। সেই সময় তাঁর সত্যবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তিনি সত্যবাবুর বাড়ীতে বসে আছেন। কোন একটি কলেজের ছাত্ররা সত্যবাবুকে Social Functionএ যাবার জন্য বলতে এসেছেন। সত্যবাবু সেই ছেলেদের বললেন—একে চেনেন ?

তারা উত্তর দিল—না।

সত্যবাবু বললেন—আগামী দিনের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে এনার আগমন হয়েছে। ইনি নতুন গান করছেন। নাম দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। একে আপনাদের Social Functionএ নিন না।

উত্তর এল—আমাদের টাকা অল্প।

সত্যবাবু বললেন—শিল্পী হিসেবে যে বড় দায়িত্ব সেটা আমার উপরও আছে। নিজে একলা গান করা নয়। অন্যান্যদের গান করানো এবং নতুনদের রাস্তা করে দেয়া তাদের স্থান দেবার জন্য। যদি না একে আপনারা সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে নিয়ে না যান, তাহলে আমিও আপনাদের Social-এ যাব না।

সত্যি সত্যিই সত্যবাবু গেলেন না সে অনুষ্ঠানে। তৎকালীন দিনে সাধক হিসেবে এরকম কোন শিল্পীকে তিনি দেখতে পাননি। সত্যবাবুর কাছ থেকে যে প্রেরণা তিনি পেয়েছেন তার কিছুটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। সেজন্য দ্বিজেনবাবুর ভাষায়—"নতুনদের আমিও আহ্বান জানাচ্ছি।"

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি গানে দরদী কণ্ঠ ও মন-ভরানো আবেগ শ্রোতার মন রামধনু রংএ রাঙিয়ে দেয়, তাঁর গানের সুর হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে প্রবেশ করে আমাদের মন প্রাণকে আকুল করে তোলে। কিন্তু কেন এই আকুলতা? বোধহয় আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যে সুর হৃদয়ের গোপনে ধ্বনিত হয় তারই বুঝি সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর গানে। তাঁর গানে গভীর হৃদয়ানুভূতির পরশমণির ছোঁয়া এসে লেগেছে বলেই, আমাদের মন যেন ভেসে যেতে চায় ঝিলমিল দূরের ঐ আকাশে।

তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গানই স্বপ্ন। দেশে যেখানে বাউল এবং ভাটিয়ালি গান শুনতেন সেখানেই গান শুনতে বসে পড়তেন। তাঁর পিতা শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে গানবাজনায় যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেন।

তিনি সপ্তম শ্রেণীতে যখন পড়ছেন সেই সময় থেকেই Radioতে গান গাইছেন। আজও আকাশবাণী থেকে আধুনিক, রাগপ্রধান গান পরিবেশন করে থাকেন। তিনি H. M. V. Record Companyতে প্রথম রেকর্ড করেন। তিনি প্রায় ৩০ বছরের একজন অভিজ্ঞ শিল্পী। তাঁর গানের মাদকতা ভাব অপূর্ব সুর ঝংকারে যেন গোলাপের পাপড়ির মত তাঁর কণ্ঠ হতে ঝড়ে পড়ে।

Inter collegiate সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় Championship এ First হন। সঙ্গীত জীবনে চলার পথে তিনি বহু Music director এর সংস্পর্শে এসেছেন। তার মধ্যে আছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, ৺অনুপম ঘটক, অনিল বাগচী, রবীন চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, অনিল

বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, আলি আকবর খাঁ এবং পণ্ডিত রবিশংকর। তাঁর গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে যেমন বহু গান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তেমনি ছায়াছবিতেও বহু গান জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। বর্তমানে তিনি 'আরোগ্য নিকেতন' ও 'রাগ ও অনুরাগ' এবং আরও বহু ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা মানবেন্দ্রবাবু, বর্তমানে আধুনিক গানে খুব বেশীরকম যে পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখা যাচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার কি মতামত?"

তিনি উত্তরে বললেন—"পাশ্চাত্যের সুর যদি কিছু আসে আসুক আধুনিক গানে। এমন কিছু নেয়া ঠিক যা গ্রহণ করা যায়, তবে এমন কিছু নেয়া ঠিক নয়—যা বর্জন করতে হবে। শুধু পাশ্চাত্যের সুর আমাদের দেশে এসেছে তাই নয়, Indian Music এর প্রভাবও পাশ্চাত্যে গিয়ে পড়েছে। আধুনিক বাংলা গানে মার্গ সঙ্গীতের আধারে রেখে East এবং West এর রং যদি কিছু আসে আসুক তাতে ক্ষতি কি?"

সবশেষে মানবেন্দ্রবাবুকে প্রশ্ন করলাম—"রাগ প্রধান বাংলা গানের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত?"

তিনি বললেন—"যা পুরোপুরি খেয়াল নয় বা হালকা আধুনিক গান নয়—অথচ গানের ভিতরে একটি রাগের প্রকাশ দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে একই ঠাঁটের অন্যান্য রাগের influence থাকাতে যদি শুনতে ভাল লাগে তাও গ্রহণযোগ্য এবং সেটাই রাগপ্রধান। উদাহরণ স্বরূপ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানগুলি সুরসাগর হিমাংশু দত্তের গান এবং কাজী নজরুল ইসলামের সুরে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কিছু গান রাগপ্রধান।"

উৎপলা সেন

সেদিন পূর্ণিমা তিথি, ছোট্ট একটি গ্রাম, নাম তার চন্দনা। গ্রামের ঐ রাঙামাটির পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে বহুদূর। পথের দুধারে সারি সারি ঝাউবন দুলছে মৃদু হাওয়ায়। তখন অনেক রাত। আমি চলেছি একা সেই পথ বেয়ে। দূর থেকে ভেসে এল এক পরিচিত কণ্ঠস্বর। শিল্পী উৎপলা সেনের গান—"চাঁদ কি ঘুমিয়ে পড়েছে, কত রাত হোল," পথ চলতে চলতে আমিও তখন ক্লান্ত। তাই সে গান শুনতে শুনতে অবাক হলাম, মুগ্ধ হলাম।

হারিয়ে গেলাম সে গানের আবেশে। শিল্পী উৎপলা সেনের প্রথম রেকর্ডের গান। "এক হাতে মোর পূজার থালা" থেকে "জোনাকী দীপ জ্বালো আলো" পর্যন্ত দীর্ঘদিন গৌরবময় জীবন খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই জোটে।

তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। গানবাজনার অনুপ্রেরণা প্রথম তাঁর মার কাছ থেকেই পান। ঢাকায় খগেশ চক্রবর্তী ও সুনীল বসু মহাশয়ের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কলকাতায় এসে ৺সুধীর লাল চক্রবর্ত্তী এবং তারপর সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি Scotisn Church college এ I. A. পর্য্যন্ত পড়েন।

কে জানত যে সেদিনের আট বছরের মেয়ের নাম একদিন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি আট বছর বয়সেই ঢাকা বেতার কেন্দ্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন মাত্র ৫ টাকা ফী নিয়ে। তিনি All India Radioর প্রত্যেক Station থেকেই গান গেয়েছেন এবং বর্তমানে নিয়মিত আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ধরণের গান পরিবেশন করেন।

১৯৪৬ সালে তিনি ৺সুধীর লাল চক্রবর্তীর সুরে "এক হাতে মোর পূজার থালা" ও "বনফুল জাগে পথের ধারে" এই দুটি গান প্রথম রেকর্ড করেন। এরপর বিমান ঘোষের সুরে "শুকতারা গো" "সকরুণ বীণা," নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে "রাতের কবিতা," সুধীন দাশগুপ্তের সুরে "পথের ধারে মুক্ত আমি ছড়িয়ে দিলাম" প্রভৃতি গান রেকর্ড করেন।

এ ছাড়া তাঁর অজস্র হিট গান আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— "ঝিকমিক জোনাকী" "ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়," "মহুয়া বনে," "ঝুমকোলতার বনে," "বাজায়ানো মোহনবীণা," "আজ থেকে সেই অনেক দিনের পরে" (সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে) সলিল চৌধুরীর সুরে "প্রান্তরেরো গান আমার।" অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে "এত মেঘ এত যে আলো," "চাঁদ কি ঘুমিয়ে পড়েছে।" অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে—"এই মনটাই করে যত গোলমাল," শ্যামল মিত্রের সুরে –"ঘুম ঘুম এই রাত," "সুন্দর রাঙামাটির পাহাড়ে।" নচিকেতা ঘোষের সুরে—"জোনাকী দ্বীপ জ্বালো আলো।" রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "যে সুর বাজাতে চাই কেন জানি না।" দূর্গা সেনের সুরে –"দূরে গেলে মনে রবে না।"

একথা আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন না যে আধুনিক গানের প্রথম Long Playing Record এ একদিকে শ্যামল মিত্র ও অন্যদিকে উৎপলা সেন। এই Record টা America Capitol Company থেকে বেরিয়েছে।

শুধু আধুনিক গানই নয়—Tagore centenary তে "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু" ও "শ্যামল ছায়া নাইবা এলে" এ দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড বেরিয়েছে। এছাড়া 'তাসের দেশ' Long playing record এ অভিনয় এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন।

এই শিল্পীর কথা বলতে গেলে দুই যুগের কথাই বলতে হয়—

তা না হলে তাঁর জীবনী লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। নিউথিয়েটার্সে শ্রদ্ধেয় বীরেন সরকার মহাশয়ের আমলে রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিকের সুরে বহু বাংলা ও হিন্দী গানে Play back করেছেন। তার মধ্যে বিমল রায় পরিচালিত 'অঞ্জন গড়' এবং প্রথম পঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ই তাঁকে Play back এ chance দেন। 'My Sister' হিন্দী ছবিতে ৺কে. এল. সায়গল ও উৎপলা সেন Solo গান করেন।

এছাড়া 'কবি জয়দেবে' নচিকেতা ঘোষের সুরে 'কি দিয়ে সাজাবি মা' M. P. র 'বাবলা' ছবিতে, সুশীল মজুমদারের 'রাত্রির তপস্যা' এবং 'দানের মর্য্যাদা' ছবিতেও কণ্ঠ দান করেন। ইদানীং কালের ছবির মধ্যে 'এক টুকরো আগুন' 'মায়াবিনী লেন' তপন সিংহের 'অতিথি' ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।

২৭।৩।৬৮ তারিখে তাঁর বাড়ীতে বসে তাঁর সম্পর্কে লিখতে লিখতে আমাত ব্যাঘাত ঘটালো সেদিনের 'অনুরোধের আসর'। আমার লেখনী বন্ধ করতে হোল কিছু সময়ের জন্য। সেই সময় বহু শ্রোতার অনুরোধে Radio তে বাজলো 'জোনাকী দীপ জ্বালো আলো' এই গানটি, শুনলাম গানটি। আবার শুরু করলাম লিখতে।

প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা উৎপলা দি, আধুনিক গান গাইতে হলে কি কি গুণাবলী থাকা দরকার?"

তিনি উত্তরে বললেন—"যে কোন সঙ্গীত পরিবেশন করতে হলে সেটা উপলব্ধি করে পরিবেশন করতে হবে। আমার প্রধান কথা হোল—উচ্চারণের স্পষ্টতার উপর, তাল লয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার এবং Expression এর অভাব থাকলে কোন সঙ্গীত পরিবেশনই সম্পূর্ণ হয় না।"

এবার প্রশ্ন করলাম—"আপনার জীবনে কোন চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে কি?"

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, ঘটেছে। তখন নিউথিয়েটার্সে ভায়োলিন

বাজাতেন তারক নাথ দে। আমার সঙ্গে তিনি Accompany করতেন। কিছু বসন্ত পার হয়ে যাবার পর এক দিন দেখতে পেলাম তারই ছেলে বিখ্যাত Flute বাজিয়ে অলোক নাথ দে সেও Radio তে আমার গানে সহযোগীতা করেছে। আমি সেই দেখে তারক নাথ দে কে প্রশ্ন করলাম—কি রে তোর ছেলেও কি আমার সঙ্গে বাজাবে ?"

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গানের কথা ও সুরের সঙ্গে বোধ হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর গাওয়া প্রতিটি গানই সুচারু রূপ নেয়। সত্যি তাঁর কণ্ঠে কি যেন এক যাদু আছে এবং যে যাদুর বলেই তিনি অনায়াসে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের হৃদয় জয় করতে পেরেছেন। আজ দিকে-দিকে জনে-জনে তাঁর গানের প্রশংসার অন্ত নেই। একদিন এই ছোট্ট মেয়েটি কান্নাকাটি করলে কেউ যদি তখন তাঁকে গান শোনাতেন তিনি চুপ হয়ে যেতেন, আর আজ তাঁর প্রাণমাতানো গানে হয়ত বহু শিশুরই ক্রন্দন থেমে যায়।

১৯৩৫ সালে তিনি কলকাতায় টালিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার বাড়ী ছিল ঢাকার বাহেরক গ্রামে আর মামার বাড়ী ছিল বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামে। তাঁর মামারা ছিলেন জমিদার বংশের লোক। পিতাও ভাল গান জানতেন। কাজী নজরুল ইসলামের কথা, সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায় Hindusthan Record Companyতে "স্বপনে কোন মায়াবি' ও 'যৌবনে হায় ফুলদোলে পায়' এই দুটি গান তাঁর পিতা রেকর্ড করেন। তাঁর পিতা ইষ্টবেঙ্গলে ফুটবলও খেলতেন। শচীন দেববর্মণ, ৺কে, এল, সায়গল পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতার গানের গলা শুনে খুব তারিফ করতেন। আজ আর তাঁর পিতা ইহলোকে নেই এবং কলকাতার আশুতোষ কলেজে কয়েকবার তাঁর পিতার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪ বছর বয়সে প্রথম প্রকাশকালি

ঘোষাল মহাশয়ের কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়। অদ্যাবধি তিনি প্রকাশকালি ঘোষাল মহাশয়ের কাছেই সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করছেন। প্রকাশকালি ঘোষালের অনুমতিতে তিনি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও ২।৩ বছর সবরকম গানই শেখেন।

আকাশবাণীতে তবলা সঙ্গত করেন যে গিরীণ চক্রবর্ত্তী তাঁরই সহযোগীতায় সুকৃতি সেনের Training এ "মালাখানি দিয়ে আমারে ভোলাতে চাও" ও "প্রিয় খুলে রেখো বাতায়ন" এই দুটি গান প্রথম Senola Company তে Record করেন।

Record করার আগে তিনি প্রথম ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ভজন আধুনিক. রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেছেন, কলকাতার বেতার কেন্দ্রে গিরীণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই গান করার যথেষ্ট উৎসাহ দেন।

তাঁর রেকর্ডের গানগুলির মধ্যে বহু গানই জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামল মিত্রের পরিচালনায় "কঙ্কাবতীর কাঁকন বাজে" সুধীন দাশগুপ্তের সুরে "বাঁশ বাগানে মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই" অভিজিৎ ব্যানার্জীর পরিচালনায় "তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা" নিতাই ঘটকের Training এ 'আমারও সোনা চাঁদের কোণা" অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "ছলকে পড়ে কলকে ফুলে" বর্তমানে রেকর্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—"তোমায় কেন লাগছে এতো চেনা", "একটি গান লিখো" "সাতটি তারার এই তিমির", "সাতরঙা এক পাখী," "কাজল ধোয়া চোখের জলে," "প্রজাপতি মন যে খুশীখুশী আজ," "প্রিয়া হবো ছিল সাধ," "তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয়।"

আধুনিক গানের রেকর্ড ছাড়াও তাঁর গাওয়া হিমাংশু দত্তের গান—(১) বনের চামেলী ফিরে আয় ও (২) রাতের দেউলে এবং কাজী নজরুলের গান (৩) নহে নহে প্রিয় (৪) যাও ফিরে যাও এবং সম্প্রতি কাজী নজরুলের গান—"না মিটিতে সাধ" ও "শুকনো পাতার নূপুর পায়ে" এই দুটি গানও Long playing Record এ বেরিয়েছে।

ছায়াছবিতে নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে যোগদানের প্রথম সুযোগ এনে দেন গিরীণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রথম 'বন্দে মাতরম' ছবিতে Chorusএ অংশ গ্রহণ করেন। Ist Solo *গান করেন* ৺*সুধীর লাল চক্রবর্ত্তীর সুরে 'সুনন্দার বিয়ে'তে* এ ছাড়া বহু ছবিতেই Play back করেছেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় 'যদুভট্ট', ছবিতে অংশ গ্রহণ করে তিনি Prize পান। 'ঢুলি' ছবিতে "নীঙ্গারিয়া নীলশাড়ী শ্রীমতী চলে" এই গানটি পরিবেশনের মাধ্যমেই তাঁর প্রথম পরিচিতি এনে দেয়। হেমন্ত মুখার্জীর সঙ্গীত পরিচালনায় 'শাপমোচন' ছবিতে "ত্রিবেনী তীর্থপথে" এই গানটি চিন্ময় লাহিড়ীর সঙ্গে তিনি গেয়েছেন, এছাড়া আলি আকবর খাঁর পরিচালনায় 'অন্তরীক্ষ' 'ক্ষুধিত পাষাণে' আমির খাঁর সঙ্গে গেয়েছেন। 'অপরাধি' ছবিতে মানবেন্দ্র মুখার্জীর সুরে নির্মলা মিশ্র ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন "আবীরে রাঙালে কে আমায়" রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে তিনি হেমন্ত মুখার্জীর সঙ্গে 'মায়ার সংসার' এবং 'হারানো প্রেমে' রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "আমি কুহেলী না স্বপ্ন" গেয়েছেন।

হেমন্ত মুখার্জীই প্রথম তাঁকে বোম্বেতে Filmএ গান করার জন্য নিয়ে যান এবং খুব সাহায্য করেন। তিনি হেমন্ত মুখার্জীর সুরে 'সাহারা' ছবিতে দুটি গজল গান করেন এবং এ গান শুনে অনেক Music Director তাঁকে Bombayতে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য Bombay থাকতে পারেন নি।

বর্তমানে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন 'চৌরঙ্গী' ও 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবিতে। অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন 'পরিণীতা' ছবিতে। আর এছাড়া 'তিন অধ্যায়' 'দিবা রাত্রির কাব্য' 'আঁধার সূর্য' 'শেষ থেকে শুরু' 'সাবরমতি' 'মনে মনে' 'কত রং কত আলো 'অনন্ত বাসর' প্রভৃতি ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে কণ্ঠদান করেছেন।

ললিতা ঘোষ

সেদিন রেডিওতে শ্রীমতী ললিতা ঘোষের গাওয়া "গান আমার পরশমণি" গানটি ভেসে এল আমার কানে। চাঁদনী রাতে তাঁর সুরেলা কণ্ঠের মায়াভরা গানে যেন মরা নদীর বুকে জোয়ার এনে দিল, নদীর বুকে জোয়ারের উপর চাঁদের আলো ঝলমল করলে মন যেমন ঢেউয়ের নূপুর হতে চায় তেমনি শ্রীমতী ললিতা ঘোষের সুরেলা কণ্ঠের ভিন্ন জাতের আধুনিক গান ঢেউয়ের নূপুরের মত ছন্দে শ্রোতার মনে এনে দেয় এক নতুন সুরের সন্ধান।

তিনি কলকাতারই মেয়ে। ছোটবেলায় যদিও বাড়ীতে গান-বাজনার চর্চা ছিল না, কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গান শুনে তার মনের ভিতরে গান গাওয়ার স্পৃহা জাগত। তিনি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের গান প্রথম শেখেন শ্রীজগদীশ বোস মহাশয়ের কাছে। ক্লাসিক ও লাইট ক্লাসিক বেশ কিছুদিন শেখেন প্রখ্যাত শিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে, তারপর জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি কিছুদিন I. A. পড়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঙ্গীত জগতে সঁপে দেন। Hindusthan কোম্পানীতে হিন্দী ভজন রেকর্ড করেছেন এবং M-gaphone কোম্পানীতে কমল ঘোষের অনুরোধে আধুনিক ও বাংলা ভজন গান রেকর্ড করেন। তাঁর কণ্ঠে বিখ্যাত গান দুটি "চলমন গঙ্গা যমুনার তীর" ও "রাধে কৃষ্ণ"; এছাড়া জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ও রবিশঙ্করের সঙ্গীত পরিচালনায় কিছু গান H. M. V. তে রেকর্ড করেছেন।

১৯৫০ সাল থেকেই তিনি বেতারে গান গাইছেন। তিনি

বর্তমানেও আকাশবাণী থেকে আধুনিক, গীত, ভজন, রাগ-প্রধান প্রায়ই পরিবেশন করে থাকেন।

আমি প্রশ্ন করলাম ললিতাদিকে—"বিভিন্ন ধরণের সুরে আধুনিক গানের মধ্যে কোন্ ধরণের আধুনিক গান গাইতে আপনার বেশি ভাল লাগে?"

তিনি উত্তরে বললেন—"আধুনিক গান একটু রাগাশ্রয়ী হলেই আমার গাইতে ভাল লাগে।"

তিনি ছায়াছবির নেপথ্য শিল্পী হিসাবে রথীন ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় 'রূপ সনাতন' ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় 'আশা' ছবিতে কণ্ঠদান করেন।

তিনি আজও যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন—আমীর খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, বেগম আক্তার, রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, রাধিকা মোহন মৈত্র, ভি, জি, যোগ, উৎপলা সেন, মালবিকা কানন, কল্যাণী রায়, D. T Jo·hi ও কণিকা ব্যানার্জী।

সব শেষে আমি প্রশ্ন করলাম—"আপনার জীবনে কোন স্মরণীয় ঘটনার কথা বলবেন কি?"

তিনি বললেন—"ঘটনার কথা না বলে স্মৃতির কথা বলি ····· আমাকে যখন চিন্ময় লাহিড়ী মহাশয় লাইট ক্লাসিক শেখাতেন তখন একদিন তিনি বললেন, তুমি লাইট ক্লাসিক কেন শিখছ? আমি তখন বললাম, আপনি তো ক্লাসিক শেখান না। তিনি বললেন, তুমি ক্লাসিক যে শিখতে চাও তাতো আমি জানিনা। পরে তিনি আমাকে ক্লাসিক এর তালিম দেন। সে কথা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছি।"

সুধীন দাশগুপ্ত

শুধু 'কি নামে ডেকে বলব তোমাকে' বা 'এই শহরে এই বন্দরে' শ্যামল মিত্রের গাওয়া এ দুটি গানই সুধীন দাশগুপ্তের সুরে জনপ্রিয় হয়েছে, তা নয়। তাঁর সুরে অজস্র হিটগান লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তিনি কথার তুলি দিয়ে সুরের ছবি এমন ভাবে আঁকেন যা সহজে ভোলা যায় না, যা স্মৃতি থেকে মোছাও যায় না। তাঁর প্রতিটি গানের প্রতিটি সুর শ্রোতায় মনে আনে আলোড়ন।

সে সুরে মন উতল হল
দোদুল ছন্দে
হাসনুহানা, ভুঁই চাঁপা আর
বকুল গন্ধে।

শুধু গানের সুর নয়, তাঁর নিজের লেখা গানের মধ্যেও কিছু নতুনত্ব আমার চোখে পড়েছে। তাঁর গানের লেখা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে মনে হয় যেন একটা ছোট গল্প পড়লাম।

তিনি ১৯২৯ সালে দার্জিলিং এ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তার খেলাধূলার প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিল। তবে তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিন বড় বড় ওস্তাদের সমাবেশ হোত। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন রবার্ট কোরিয়া, জর্জী ব্যাংকস্, ও ক্যাপ্টেন ক্লিভার কাছে। ১৯৪৯ সালে তিনি 'Royal School of Music in London' থেকে Music এর ডিপ্লোমা পান। তিনি সেতারও বাজাতে পারেন। এছাড়া তিনি পিয়ানো একর্ডিয়ানও বহু রেকর্ডে বাজিয়েছেন।

দীর্ঘদিন দার্জিলিং এ কাটার পর তিনি ১৯৫০ সালে কলকাতায়

চলে আসেন। কলকাতায় এসে প্রথম তিনি কমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের Assistant হিসাবে যোগ দেন। সেই সময়ই 'মালঞ্চ' 'ফুলওয়াড়ী' 'প্রার্থনা,' 'নওবিধান' প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেন।

তিনি H. M. V. তে প্রথম বেচু দত্তের (১) কেন আকাশ হতে আজ নিশীথে তারা ঝরে যায় ও (২) কত আশা ও ভালবাসা এই দুটি গানে সুর দেন। এরপর দ্বিজেন মুখার্জীর (১) ভাঙা তরীর শুধু এ গান (২) এই ছায়া ঘেরা কালো আঁখি—এই দুটি গানে এবং তারপর গায়ত্রী বসুর (১) সূর্য্য কোথা যাও এ গানে সুরারোপ করেন। তারপর বহু গান নিজের লেখা নিজের দেয়া সুরে শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী গেয়েছেন এবং প্রায় সব গানই জনপ্রিয় হয়েছে।

তাঁর গান লেখার ব্যাপারে প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী মহাশয় যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেন। এ কথা আজও তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সুধীনবাবুকে প্রশ্ন করলাম—"আধুনিক বাংলা গান বলতে আপনার কি ধারণা?"

তিনি উত্তরে বললেন—"আধুনিক গান পরিবর্ত্তনশীল। সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলছে, যুগের হাওয়ার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলছে। আধুনিক গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, পল্লী সুর আর পাশ্চাত্য সুরের যেন এক অপরূপ মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়ে:

তিনি বহুদিন থেকেই ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। তিনি প্রথম 'উল্কা' এবং তারপর 'ডাকহরকরা' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে 'তিন ভুবনের পারে' 'কখনো মেঘ' 'সজারুর কাঁটা' ও 'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

এবার সুধীনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—"Lyric এর বর্তমান সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?"

তিনি বললেন—"আধুনিক কবিতার যেমন অগ্রগতি হয়েছে

আধুনিক গানের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। কারণ দু একজন গীতিকার ছাড়া আধুনিক গানের নতুন Form এর কথা চিন্তা করেন বলে মনে হয় না।"

জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা সুধীনবাবু এবার বলুন আপনার মতে Modern গানের Composition কি হওয়া উচিত?"

তিনি বললেন—"আধুনিক গান যেন একটা ছোট গল্প। এটা একটা মনের মধ্যে মুহূর্ত্তের মিনার তৈরী করে দেয়। আর ভাল গান কাকে বলা হবে যদি বলেন, তাহলে আমার মতে Image এর ভাল ব্যবহার শব্দ চয়ন এবং নতুন Form এর Proper Combination হলেই সেটা ভাল গান হবে। কিন্তু এখনকার দিনে যে আধুনিক গান তাতে আধুনিক কবিতার Image এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ খুবই কম থাকছে। তবে এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ তা না হলে গানের Form এর কোনদিনও পরিবর্ত্তন হবে না এবং আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো।"

সুবীর সেন

"তোমরা আমার গান শুনে আজ দিচ্ছ মালা
হয়ত এমন দিন আসবে ওগো
যখন, এই সভারই একটি কোণে অন্ধকারে
একটু দূরে আমায় দেখে কেউবা বলবে হেঁকে
কে আবার ডাকলো একে
সেখানে থাকবে যারা বলবে সরে দাঁড়া
আমার কণ্ঠ ছাড়া কে আর ভালবাসবে ওগো
এমন দিন আসবে ওগো।"

সুবীর সেনের গানের কথাগুলি যে সুরে ব্যক্ত হয়েছে তা প্রতিটি মানুষের অন্তরে ঘা না দিয়ে পারে না। বিচিত্র এই জগৎ তার বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে গড়া এই পৃথিবীর মানুষ। তাই গান শুধু আজকের দিনের অনুভূতি নিয়েই নয়, আগামী দিনে কি হতে পারে তারই প্রতিফলন সুবীর সেনের ঐ গানটিতে। তিনি ঐ গানের কথা ও সুরকে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা যে কোন শিল্পীর তার মনের কথাকেই বাস্তবের দর্পণের সামনে তুলে ধরেছেন।

১৯৩৪ সালের ২৪শে জুলাই তিনি আসামে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে মা পিসিমা গান বাজনা করতেন এবং তাঁর মামার বাড়ীর দিকেও গানবাজনার চর্চা ছিল। তিনি লক্ষ্ণৌর 'মরিস কলেজ অফ্ মিউজিকের' শাখা "জ্ঞানদায়িনী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে" সাড়ে তিনবছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন। আর কলেজ জীবনে তিনি চিন্ময় লাহিড়ী, অনুপম ঘটক, উষারঞ্জন মুখার্জীর কাছে গান শেখেন।

তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে

কলকাতার আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এখান থেকেই I. com. পাশ করেন। তারপর এখান থেকেই তিনি B. A. পাশ করেন।

১৯৫৪ সালে যে সঙ্গীত প্রতিযোগীতা হয় তাতে ১২০০ জন অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৩ জন নির্বাচিত হন রেকর্ডের জন্য। এই ৩ জনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ১৯৫৫ সালেই H. M. V. তে. সুধীন দাশগুপ্তের সুরে তাঁর প্রথম রেকর্ড হোল—"স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে।"

হিন্দী ছায়াছবির ক্ষেত্রে গুরু দত্ত তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। ১৯৫৮ সালে তিনি Bcmbay যান। "কাঠপুৎলি" ছবিতে শঙ্কর জয়কিষণ তাঁকে "Exclusive Artist" হিসাবে নেন যা খুব কম শিল্পীর ভাগ্যে জুটেছে। শঙ্কর জয়কিষণের সুরে তিনি 'আশ্ বা পঞ্ছী' 'ছোটি বহেন' 'বয় ফ্রেণ্ড' 'রূপ কি রাণী চোর কা রাজা' 'আপনে হুয়ে পড়ায়ে' ছবিতে কণ্ঠ দান করেন। সর্দ্দার মালিক, বুলোসিরানী, এস, এন, ত্রিপাঠীর সুরেও বহু ছবিতে রেকর্ড করেছেন। এ ছাড়া বহু ছবিতে বসন্ত দেশাই, হেমন্ত মুখার্জী, কল্যাণজী আনন্দজী, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সুরে গান করেছেন। বসন্ত দেশাই এর 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' হেমন্ত মুখার্জীর 'হাম ভি ইন সাম হ্যায়' কল্যাণজী আনন্দজীর 'পাশপোর্ট' 'ও তেরা কেয়া ক্যাহেনা' এবং রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাশুম', এই 'মাশুমের' গান শুনিয়েছিলেন স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে। তিনি তাঁর গান শুনে বলেছিলেন—"ফিল্মমোমে অ্যায়সা গানা হোতা হ্যায় ?"

বাংলা দেশের ছবির মধ্যে 'সরি ম্যাডাম' 'মোমের আলো' এবং বর্ত্তমানে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় 'অপরিচিত' এবং অভিজিৎ ব্যানার্জীর সঙ্গীত পরিচালনায় 'ছায়াতীর' ছবিতে Play back করেছেন।

আধুনিক গানের বহু রেকর্ডের মধ্যে সবগুলিই অন্যের সুরে

নয়। তাঁর নিজেরও কলেজ জীবন থেকে সুর করার অভ্যাস আছে। তাঁর নিজের সুরে 'রাত হোল নিঝুম' এই গানটি H. M. V. তে Record হয়।

আধুনিক গানের রেকর্ড ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ডের সংখ্যাও কম নয়। তার মধ্যে আছে—'মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম' 'মেঘ বলেছে যাব যাব' 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' হেমন্তে কোন বসন্তের বাণী' 'নবীন মেঘের সুর লেগেছে' ও 'বহু যুগের ওপার হতে।'

তিনি ১৯৬০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ওয়েষ্ট ইনডিজ, সাউথ আমেরিকার কয়েকটি জায়গা এবং আরবের কয়েকটি জায়গা এবং লণ্ডনে যান এবং প্রায় ৪৫টি Commercial show করেন। ১৯৬১ সালে তিনি East Africa পরিভ্রমণ করেন এবং ৫৫টি Commercial Function এ অংশ গ্রহণ করেন। মরিসাসে French এবং English people এর জন্য আলাদা ভাবে Show করে এসেছেন। Cania Broadcasting এ Western Music Department অনুরোধ করলে তিনি কিছু গান Tape Record করেন।

আধুনিক গানের উপর পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন—"ও দেশের Division of tone আমাদের দেশের আধুনিক গানের মধ্যে পাইনা। তবে Indian Melody পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ Melody কিন্তু Western এ Music arrangement খুবই সুন্দর। বর্তমানে Film এ যে সব Experiment হচ্ছে তাও সবই Western এর অনুকরণে। সাধারণের ধারণা ইংরাজী সুর বলে কিছু আছে। পৃথিবীর সবদেশের Folk song এর মধ্যে একটা মিল আছে। কিন্তু ও দেশে কোন নিজস্ব সুর নেই।"

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত জগতে আর এক আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী শৈলেন মুখোপাধ্যায়। তাঁর গানের জনপ্রিয়তা আজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সঙ্গীত পরিবেশন করে অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন যা তাঁর সঙ্গীত জীবনের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছে। সুরকার থেকে শিল্পী জীবনে প্রবেশ হলেও তিনি আজও সুরের খেলায় মেতে আছেন। সুরকার ও শিল্পী জীবন এই দুই ধারার সার্থক রূপায়ণে যিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সেই স্বনামধন্য শিল্পী শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

১৯৩২ সালে তিনি কলকাতার কালিঘাটে মুখার্জী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ীতে গানবাজনার চর্চা ছিল। তাঁর বাবাই প্রথম গানবাজনার অনুপ্রেরণা দেন। তিনি প্রথম গান শেখেন অখিলবন্ধু ঘোষের কাছে। তারপর অপরেশ লাহিড়ীর কাছেও বেশ কিছুদিন গান শেখেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন কুমারেশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে এবং ফণী গুপ্ত মহাশয়ের কাছেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দীর্ঘদিন শেখেন। একথা শুনলে আপনারা অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন যে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত কারুর কাছে শেখেননি, তিনি নিজেই দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছেন এবং তাঁরই কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত আজও আমরা বেতারে শুনে থাকি।

১৯৪৬ সালে তিনি Kalidhan Institution থেকে Matric পাশ করেন এবং I. A. পাশ করেন Vidyasagar College থেকে। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে B. A. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তাঁর জীবনের একটা গৌরবময় অধ্যায় ১৯৪৮ সাল। ১৯৪৮ সালেই প্রথম West Bengal-এ যে ২২ জনকে নিয়ে N. C. C. দল তৈরী হয় তার মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

১৯৪৬ সালেই ছোটোখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তাঁর জনসাধারণের কাছে প্রথম পরিচয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম তিনি কবি শৈলেন রায় রচিত 'কাঁকন ও রিনিঝিনি শুনেছি' 'ওহে অভিমানিনী বল বল' এই দুখানি গানে সুর দেন এবং এতে কণ্ঠদান করেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৫৭ সালে সাফল্যের সঙ্গে বটকৃষ্ণ দে রচিত 'স্বপ্ন আমার ওগো' 'সাতি তারা ডুবে গেল' এই দুখানি গানে নিজেই সুর ও কণ্ঠ দান করেন। তারপর ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাস তাঁর জীবনের স্মরণীয় মাস। এই বছরের এই মাস থেকেই তিনি বেতারে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

তিনি বহু গান যেমন নিজে সুর দিয়েছেন এবং তেমনি বহু গানও নিজে রেকর্ডও করেছেন যে গুলি সঙ্গীত রসিকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে এবং যা আজও শ্রোতার মন একবার শুনে তৃপ্ত হয় না। বারবার মন চায় সে গান শুনতে যেমন 'স্বপ্ন আমার' 'এ মন আমার যেন' 'তোমায় দেখেছি কতরূপে কতবার' 'ওগো লজ্জাবতী' 'সাগরের দুটি ঢেউ।' সতীনাথ মুখার্জ্জীর সুরে—'এত যে শোনাই গান' 'মোর গান একি সুর পেলরে' 'দাঁড় ছপ ছপ' 'তুমি আমার মিলন অতিথি' 'আকাশ নদীর বুকে নেমে এসেছে' 'তোমার মনের ওই প্রান্তে' 'ঝর্ণা ঝর্ণা তার জলচুড়িটি' 'চাঁদের আলোয় রাতের পাখী' 'সহেলী রূপ দেখালী' 'তুমি কাঁকন কখন বাজিয়ে' 'নগরে বন্দরে।'

আর তাঁর দেয়া সুরে যেসব শিল্পী কণ্ঠদান করেছেন তার মধ্যে আছেন—বাসবী নন্দী, ইলা বসু, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখার্জী, গায়ত্রী বসু, বাণী ঘোষাল, আরতি মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, পিন্টু ভট্টাচার্য, নির্মলা মিশ্র, সুবীর সেন, মৃণাল চক্রবর্ত্তী এবং যে শিল্পী আজ ইহলোকে নেই, দুখানি গান গেয়েই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন সেই দুটি গান 'শ্রীমতী যে কাঁদে' ও 'কিছু নাই তবু দিতে চাই।' শিল্পী মলয় মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই জনপ্রিয় গান দুটিতে তিনিই সুর দিয়েছেন।

তাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ডের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান 'দূরের বন্ধু' 'আকাশ পারে' 'আলো আমার আলো' 'কিছু বলব বলে' 'বিরস দিন' 'বসন্ত বসন্ত' এবং বাসবী নন্দীর সঙ্গে দ্বৈতসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন—'আজি যত তারা' 'নয় নয় মধুর।' এই দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীতে। এছাড়া তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' 'মায়ার খেলা' 'তাসের দেশ' ও 'বাল্মিকী প্রতিভা' প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া তিনি Children little Theatre এর Governing Body-র একজন সক্রীয় সদস্য এবং কলকাতার Artist Association গঠন করার মূলে তাঁর অবদানও যথেষ্ট।

১৯৬৩ সালে 'দোলনা' প্রথম ছায়াছবির গান পরিচালনা করেন। তারপর করেন 'দোল গোবিন্দের কড়চা' আর বর্তমানে 'প্রতিদানে' তিনি নিজে গাইছেন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করছেন।

সবশেষে আমি প্রশ্ন করলাম শৈলেনবাবুকে—"Please tell me just about philosophy of your Music".

তিনি স্মিত হেসে বললেন সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গীত সম্পর্কে উক্তি—"যে সঙ্গীতে নিছক চাকচিক্য নেই, আছে সাধনা ও একাগ্রতা, সেই সঙ্গীতই আমার প্রিয়"

অনল চট্টোপাধ্যায়

আমরা কজনকে চিনি আর কজনকেই বা জানি। সঙ্গীত জগতে কত লোকের নিত্য যাওয়া আসা, কত শিল্পীর গান শুনে আমরা বাহবা আর হাততালিতে ফেটে পড়ি। কিন্তু সেই গানের রচনা ও সুরসৃষ্টি যিনি করেছেন তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার আমাদের অবকাশ নেই। অথচ আমরা সেই গান নিয়ে খুব হৈ হৈ করি—আনন্দ করি। একবারও সেই চোখ ধাঁধানো আলোর পিছনে যাদের সত্যিকারের এই শিল্প সৃষ্টিতে গানগুলি রমণীয় হয়ে উঠেছে তাদের জানতেও চেষ্টা করি না। সেদিন অনলবাবুর কাছে এমন কিছু শুনলাম, যা শুনে আমি নিজেও বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম এবং তাঁকে প্রশ্নই করে বসলাম—"তাহলে শিল্পী গীতা দত্তের গাওয়া 'ঐ সুরভরা দূর নীলিমায়' ও 'আয় আয় ময়নামতীর গান' এই দুটি গান আপনারই লেখা?"

অনলবাবু স্মিত হেসে বললেন "হ্যাঁ আমারই লেখা।" দেখুন, তাহলে বুঝুন আমি নিজে সঙ্গীতজগতে থেকেও এ কথা জানিনা। আর আপনাদেরই বা কি দোষ দেবো বলুন? যার কথা ও সুরে বহু গান রেকর্ড হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সেই প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

১৯২৮ সালে সালকিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই নিজের গান লেখবার এবং সুর করবার প্রচেষ্টা ছিল। এছাড়া তাঁর পরিবারেও বাবা, ঠাকুরমা গান গাইতেন এবং লিখতেন। বুঝি তাঁদেরই আশীর্বাদের পরশমণির ছোঁয়া এসে লাগল অনল চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে। প্রথম জীবনে একদিকে সাহিত্যিক হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আর অন্যদিকে গাইয়ে হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। সাহিত্য ও সঙ্গীতের দুই ধারা পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে রূপ নিল গীতিকার ও সুরকার হিসাবে। সাহিত্য চর্চার সময়—তাঁরই লেখা ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত "রত্নতৃষা" কিশোর রোমাঞ্চ উপন্যাস তৎকালীন সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৮ সালে কাল বৈশাখীর ঝড়ে তাঁর জীবনের মোড় যিনি ঘুরিয়ে দিয়ে গেলেন তার পুরোধা হচ্ছেন প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী। তিনি যখন শুধু গান লিখতেন তখন তাঁর মনে হতো কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কিছু যেন অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সেই শূন্য স্থান পূরণ করে তিনি এবার হলেন গীতিকার থেকে সুরকার।

তিনি শিক্ষার্থী হিসাবে সলিল চৌধুরী মহাশয়ের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। এ ছাড়া তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রেরণা পেয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন গনেশ বসু ও নিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদারের কাছে। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘেরও একজন সক্রীয় সদস্য ছিলেন। শুধু গান বাজনা ছাড়াও তিনি পড়াশুনার প্রতিও উপেক্ষা করেন নি। তিনি Vidyasagar College এ B. Sc. পর্য্যন্ত পড়েন।

আমি প্রশ্ন করলাম—"আপনার সঙ্গীত জীবনে কি কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে?"

তিনি উত্তরে বললেন —"হ্যাঁ ঘটেছে বৈকি। সে এক মজার কথা। আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের রেকর্ডের গান শুনে আমি মনস্থির করে ফেললাম—গান শিখতে হলে ঐ ভদ্রমহিলার কাছেই শিখতে হবে। কিন্তু ঘটনার প্রচ্ছপদ পাল্টে গেল। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে দেখতে পেলাম শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রই হচ্ছেন আমার গানের সুরে পরিচালিত প্রথম শিল্পী।"

তিনি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কেবল গানই লিখেছেন। তাঁর লেখা যে গানগুলি রেকর্ডের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামল মিত্রের সুরে হেমন্ত মুখার্জী গেয়েছেন—"ক্লান্ত চাঁদের নয়নে ঘুম" প্রতিমা ব্যানার্জী —"কঙ্কাবতীর কাঁকন বাজে।" দ্বিজেন মুখার্জী—"ওগো কৃষ্ণচূড়া," তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"আনারকলি," অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সনৎ সিংহ গেয়েছেন—"রথের মেলা," "নাগর দোলা," সুধীন দাশগুপ্তের সুরে সুবীর সেন গেয়েছেন—"তোমার হাসি লুকিয়ে হাসে," আর কানু ঘোষের সুরে গীতা দত্ত গেয়েছেন—"ঐ সুরভরা দূর নীলিমায়," "আয় আয় ময়নামতীর গান।"

১৯৫৭ সালে তাঁর নিজের কথা ও সুরে রেকর্ড হল শিল্পী বাণী ঘোষালের গাওয়া—"গীতালী গীতাঞ্জলী," এছাড়া সুরকার হিসেবে যে গানগুলি তাঁর নিজের সুরে রেকর্ড হয়েছে এবং আজও লোকের মুখে মুখে ফিরছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান—প্রতিমা ব্যানার্জীর—"ছলকে পড়ে কলকে ফুলে," "মেঘ রাঙানো অস্ত আকাশ," "প্রজাপতিরে," "কাজল ধোঁয়া চোখের জলে," "গঙ্গা অঙ্গে তোমার," "আকাশে জাগে কত যে আলো।" ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের—"বলেছিলো কি যেন নাম তার।" মানবেন্দ্র মুখার্জীর—"নালিশ নাই মোর কারো কাছে," "ও সোনা বঁধুরে," "ওই চন্দ্রকলা সেতো।" গীতা দত্তের—"কৃষ্ণনগর থেকে," "কত গান হারালাম।" উৎপলা সেনের—"এই মনটাই করে যত গোলমাল।" ইলা বসুর—"তুমি নেই তাই" "নয়নে বরষা।" তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—"ফুলের বাজু বন্ধ দিলাম," "মধুমতী যায় বয়ে যায়"।" সনৎ সিংহের—"সরস্বতী বিদ্যেবতী" "আমি বহুরূপী।" মৃণাল চক্রবর্তীর—"ঢেউ ঢেউ উথাল পাথার।" সুবীর সেনের—"তোমার শিশির ভেজা।" আরতি মুখার্জীর—"জানি এ ভুল," "মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকোনা" "তুমি যে মোর সূর্যময়।" দ্বিজেন মুখার্জীর—"ক্লান্ত যে আমি।" নির্মলা মিশ্রের—"আমি পরাতে

চেয়েছিলাম," "আকাশ পারে তারায় তারায়।" আর পিন্টু ভট্টাচার্যের স্মরণীয় গান—"আমার দুখের রজনী," "ফিরে যেতে চাই" "না দেখাই ছিল ভালো," "জানি পৃথিবী আমায় যাবে ভুলে।" রেকর্ডের ব্যাপারে আজও যাদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন—

সুপ্রীতি ঘোষ, গীতিকার পবিত্র মিত্র, ক্ষিতীশ বসু, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও বিমান ঘোষ।

১৯৫৭ সালেই তিনি আকাশবাণীর গীতিকার হিসাবে স্বীকৃতি পান। তাঁর কথা ও সুরে কয়েকটি গান রম্যগীতির জন্য আকাশ বাণীতে রেকর্ড হয়েছে। তাঁর নিজের দেওয়া সুরে দ্বিজেন মুখার্জী গেয়েছেন—"খেয়াঘাটে কার ঢেউ এসে লাগে।" বাণী ঘোষাল গেয়েছেন—"ঝর ঝর ঐ বাদল," আর নিজের লেখায় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে শ্যামল মিত্র গেয়েছেন—"ঢ্যাম কুড় কুড়।"

শুধু রেকর্ড সঙ্গীত পরিচালনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। চলচ্চিত্রে সলিল চৌধুরীর সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে "পাশের বাড়ী' 'বাঁশের কেল্লা' 'রিক্সাওয়ালা' 'আজ সন্ধ্যায়' 'ভোর হয়ে এলো' 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' 'মহিলামহল' ও 'গঙ্গা।' প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন।

চলচ্চিত্রে যুগ্ম আবহসঙ্গীত পরিচালক হিসাবে 'রাত ভোর' ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। 'যাত্রী' ছবিটিও নিজের সুরে পরিচালিত হয়। তাঁর প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা 'মায়াবিনী লেন'। বর্তমানে 'মনে মনে' 'বহ্নিশিখা' 'কত রং কত আলো' 'অনেকদিনের আশা।' প্রভৃতি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য যাদের অকুণ্ঠ সহযোগীতা পেয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন—স্বর্গীয়া সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, প্রমোদ লাহিড়ী ও কনক মুখার্জী।

আমি প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা অনলবাবু, আধুনিক গানের মধ্যে

পাশ্চাত্য সুরের যে প্রভাব দেখা যাচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার কি মতামত?"

তিনি জোরালো ভাবে উত্তর দিলেন—"অন্ধ অনুকরণ নয়, তবে আমাদের সঙ্গীত নিয়ে যদি পাশ্চাত্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে পারে, তাহলে আমরাই বা নেব না কেন? যে সমস্ত গান যুগোত্তর হয়েছে পূর্ববর্ত্তী সঙ্গীতকারদের সৃষ্টিতে, সেগুলি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে তাতেও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। তাই সঙ্গীত রচনার নব নব সৃষ্টিতে যদি পাশ্চাত্য সঙ্গীত এসে পড়ে এবং ভারতীয় সুরের সাথে এবং তার সাংস্কৃতিক মূল্য বজায় রেখে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মাঝে যে সৃষ্টি হবে তাও নিশ্চয় সঙ্গীত সমাজে সমাদর লাভ করবে।"

সবশেষে অনলবাবুকে প্রশ্ন করলাম—"আধুনিক গানের শিক্ষাপদ্ধতি কি হওয়া উচিত?"

তিনি বললেন—"অনেকের ধারণা শুধু Radio ও Record এর গান শুনে আধুনিক গান গাওয়া যায়। কিন্তু আমার মতে আধুনিক গান গাওয়া অত্যন্ত কঠিন, বিশেষভাবে স্বরসাধনা ও তৈরী কণ্ঠ ছাড়া আধুনিক গান গাওয়া খুব শক্ত। তাই প্রাথমিক ভাবে স্বরসাধনা ও স্বর বিস্তার প্রয়োজন। ভাব এবং আবেগের জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ও পল্লীগীতি, কিছুটা শেখা প্রয়োজন। প্রাচীন বাংলা গানের গায়কী সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং কিছুটা পাশ্চাত্য স্বরনিক্ষেপ পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলায় অভ্যেস করা এবং সর্বোপরি সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা, গানের কথার মূল্যবোধ আর সঙ্গীতশিল্পীজনিত হৃদয়বৃত্তি এইগুলির সমন্বয় ঘটলে তবেই আধুনিক শিল্পী হওয়া যায়।"

প্রবীর মজুমদার

খ্যাতনামা সুরকার ও গীতিকার হিসাবে প্রবীর মজুমদারের নাম সঙ্গীত জগতে বিশেষ পরিচিত। তাঁর গানের প্রতিটি সুর যেন কয়েক পশলা বৃষ্টি হবার পর এক ঝলক রোদ্দুরের মত। তাঁর সুরের সুরভিতে শ্রোতার মনকে যেন আকুল করে তোলে। বাতাসেরা কি যেন কয়ে যায়, রাতও বুঝি আকাশের কানে কথা কয়। তাঁর সুরের সুরভিতে আজ সবাই মুগ্ধ, বিস্মিত। তাঁরই দেয়া সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা—নির্মলা মিশ্রের "ও তোতাপাখীরে" এ গানটির রচয়িতাও তিনি স্বয়ং।

১৯৩১ সালে ৬ই জানুয়ারী তিনি দক্ষিণ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন কাজী নজরুল ইসলাম, রাইচাঁদ বড়াল, অনুপম ঘটক, কমল দাশগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন তাঁর পিতা স্বর্গীয় সুরবন্ধু মজুমদার এবং তিনি All Indio Radio-র Adviser ছিলেন এবং তাঁর Music Direction-এ বহু গান হয়েছে। পরিবারের মধ্যে প্রবীর মজুমদারের পিসীমা আশালতা রায় এবং দিদি রেবা মজুমদার গানবাজনা জানতেন। তাঁর বড় ভাই সুবীর মজুমদার একজন সঙ্গীত বিশারদ এবং ছোট ভাই সমীর মজুমদার শাস্তা প্রসাদের ছাত্র। তাঁর ঠাকুরদা দীনবন্ধু মজুমদার গান বাজনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। প্রবীর মজুমদারের পিতার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে Music Director হিসেবে তৈরী করা এবং সেদিকে বরাবরই লক্ষ্য ছিল।

১৯৪৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন Lake view High School থেকে, এবং B. Com. পাশ করেন City College থেকে।

তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন গণেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে। পল্লী সঙ্গীত শেখেন তাঁর পিতার কাছে এবং তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাল্পনিক গুরু প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। শান্তিদেব ঘোষ ওনার কাকা। তাঁর Music Director হবার ইচ্ছা বরাবরই ছিল। সঙ্গীত পরিচালনার বিদ্যা শেখেন অনুপম ঘটক মহাশয়ের কাছে। প্রথম 'তুলসীদাস' ছবিতে শিক্ষানবীশ সহকারী হিসেবে যোগ দেন। তারপর প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরীর সঙ্গে প্রধান সহকারী হিসেবে সঙ্গীত পরিচালনা করেন 'পাশের বাড়ী' ছবিতে। এ ছাড়া 'বাঁশের কেল্লা' 'ভোর হয়ে এলো' 'রিক্সাওয়ালা,' 'আজ সন্ধ্যায়,' 'মহিলা মহল,' 'দো বিঘা জমিন' প্রভৃতি ছবিতে প্রধান সহকারী হিসাবে সঙ্গীত পরিচালনায় অংশ নেন।

তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘেও সঙ্গীত পরিচালনার কাজে সাহায্য করতেন। ১৯৫৯ সালে তিনি বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীও একজন All India Radio-র জনপ্রিয় শিল্পী চিত্রা মজুমদার।

তাঁর স্ত্রী Ecotone Record Company-তে 'যত বল ফুল তুমি ফুটোনা' ও 'চেওনা চেওনা অমন করে' এ দুটি গান রেকর্ড করেন। চিত্রা মজুমদারের আলাউদ্দিন খাঁ এবং আলি আকবর খাঁর পরিবারের সঙ্গে ভীষণ হৃদ্যতা ছিল এবং এখনও আছে। তিনি চিন্ময় লাহিড়ী ও মুরারী মোহন বিশ্বাসের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন এবং আধুনিক গান শেখেন মানবেন্দ্র মুখার্জী ও তাঁর স্বামী প্রবীর মজুমদারের কাছে। একমাত্র কন্যা সায়ন্তনী মজুমদার— শিশুমহলের শিল্পী এবং আগামী দিনের প্রতিভার স্বাক্ষর তার মধ্যে এখনই ফুটে উঠেছে।

প্রবীর মজুমদারের রেকর্ড জীবনে জনপ্রিয় গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণী ঘোষালের "শোন মাটিতে আজ জীবনের আভাষ।' তারপর দ্বিজেন মুখার্জীর "মন ছুটেছে তেপান্তরে"

তরুণ ব্যানার্জী—"সহেলী অনেক দূরের নির্জনে" এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের—"মাটিতে জন্ম নিলাম।"

তারপর নির্মলা মিশ্রের—'আকাশ মেঘ দে পানি দে' 'ও তোতাপাখীরে' 'ও আমার মন পাখীকে খুন করেছে।' তরুণ ব্যানার্জীর—'ওই পদ্মকাঁপা জলে' 'ফুল নেবে গো নীল পদ্মের হার।' সনৎ সিংহের—'এক এক্কে এক' 'দিল্লী কি বোম্বাই, কি গৌহাটি' 'ঠিক দুপপুর বেলা।'

সুবীর সেনের—'মনের আকাশ জুড়ে।' শ্যামল মিত্রের E. P. Record—'আমি দিশাহারা রাতে।' চিত্রা মজুমদারের—'যত বল ফুল তুমি ফুটোনা' ও 'চেওনা চেওনা অমন করে।' জপমালা ঘোষের—'কাটুম কুটুম বুড়ো।' এই জনপ্রিয় সুরের গানগুলির মধ্যে অধিকাংশ গানই প্রবীরবাবুর স্বরচিত।

তিনি All India Radio-র রম্যগীতিতে বহু গান পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সুপ্রীতি ঘোষের—'সাঁঝ বেলাকার পিদীমরে।' তরুণ ব্যানার্জীর—'কনকচাঁপা ধান।' সনৎ সিংহ ও মাধবী চট্টোপাধ্যায়ের—'ভানুমতী ভেলকী লাগে।' শ্যামল মিত্রের—'বউ ঝিউরি গো।' প্রতিমা ব্যানার্জীর—'বউ কথা কও পাখী।' দ্বিজের মুখার্জীর—'আকাশ জুড়ে উদাসী মেঘ।' ইলা বসুর—'কি হবে ফুলেরই বন' এবং অংশুমান রায়ের—'ধান সিঁড়ি নদীটির নির্জন তীরে।'

তিনি গ্রামাফোন রেকর্ডের গানই পরিচালনা করেননি বহু ছায়াছবির গানও নিজে পরিচালনা করেছেন। ১৯৫৫ সালে পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং নাম ভূমিকায় ছিলেন কানু ব্যানার্জী, এই ছবিতে প্রসূন ব্যানার্জীর গান—'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই' খুবই জনপ্রিয় হয়

১৯৫৬ সালে 'পশারিণী' ছবিতে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানের রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৪ সালে পরবর্ত্তী জনপ্রিয় ছবি রাজেন তরফদারের 'জীবনকাহিনী' তার মধ্যে হেমন্ত মুখার্জীর

গাওয়া 'আমি তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে বাঁচার নিশানা' খুবই জনপ্রিয় হয়। বর্তমানে রাজেন তরফদারের সঙ্গীত মুখর 'বনমর্মর' ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এটি পুরোপুরি বাংলাদেশের উপেক্ষিত অঞ্চলের লোকগীতির উপর, দীর্ঘ গবেষণা নিয়ে প্রবীরবাবু খুবই ব্যস্ত। এছাড়া নিত্যানন্দ দত্তের 'নায়কের জন্ম' এবং রাজকুমার মৈত্রের 'মহুয়া বড় মিষ্টি' ছবিতে সুরসংযোজনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

আমি প্রবীরবাবুকে প্রশ্ন করলাম—"আধুনিক গানের শিক্ষা-পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?"

তিনি উত্তরে বললেন—"আধুনিক গানের মূল বক্তব্য হোল কথাটাকে সুরে প্রাণবন্ত করা। কথার Sketch কে ভাবের তুলি দিয়ে সুরের রং দিয়ে এঁকে যাওয়া, এবং মূল কথা হোল Expression of the words. Music-এর মধ্যে যে Drama আছে সেটাকে প্রকাশ করা সম্ভব তখনই যখন সে শিল্পী ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, বিদেশী সঙ্গীত এবং সমস্ত সঙ্গীতেই বেশ কিছু দখল থাকবে। আধুনিক গানের জন্য সবকিছু থেকে আলাদা ধরণের কণ্ঠের প্রয়োজন এবং সেই কণ্ঠটিকে গানের নাটকীয়তা প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্পী যাতে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেইরকম একটা শিক্ষার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত রচনার কথা ও সুর দিয়ে যেভাবে ছবি এঁকে গেছেন যে শিল্পী অন্তর দিয়ে সেই ছবিকে উপলব্ধি করতে পারবে সেই শিল্পীই বুঝতে পারবে গানের ভিতরকার নাট্যবস্তু কি, এবং সেই নাট্যবস্তুকে প্রকাশ করার ক্ষমতা আনতে হলে নিয়ন্ত্রণক্ষম কণ্ঠ চাই। সেই কণ্ঠটিকে শিক্ষা দ্বারা আয়ত্তে আনতে পারলেই একমাত্র সেই শিল্পীই আধুনিক গান গাইবার পাশপোর্টটা পেতে পারে। এবং যত রকমের সঙ্গীত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এবং কষ্টসাধ্য আধুনিক গান। কারণ এ গানের পরিসর 'অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সময় অত্যন্ত পরিমীত অথচ অভিব্যক্তির প্রাধান্যটা বিরাট।"

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরকার হিসাবে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজ সকলের মুখে মুখে। কথা ও সুরের মিলন নদীতে তিনি আজও সমানে তরী বেয়ে চলেছেন। তাঁর সৃষ্ট গানের সুরের জনপ্রিয়তা যে ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

১৯৩১ সালের ২৪শে জুলাই তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। গোড়া থেকেই পিতা এবং মাতা দুজনের পরিবারেই গানবাজনার চর্চ্চা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি গানবাজনার প্রতি আকৃষ্ট হন মাতাপিতার অনুপ্রেরণায়।

তিনি প্রথম থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চ্চা শুরু করেন এবং অনিল রায় মহাশয়ের কাছে বেশ কিছুদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন। তারপর তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। কিন্তু সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রকৃত শিক্ষাগুরু হিসাবে সলিল চৌধুরী মহাশয়ের অনুপ্রেরণা আজও তাঁর জীবনে প্রগতির একমাত্র পাথেয়।

১৯৫১ সালে তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে I. Sc. পাশ করেন। তারপর জীবন ও জীবিকার বৈষম্যের মাঝ থেকে সঙ্গীতকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত সরকারী চাকরী করেন। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘেরও একজন সক্রীয় সদস্য থাকায় তিনি সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত হন।

সঙ্গীত জীবনে তাঁর রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল মূলচর্চ্চা। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়েও চর্চ্চা করেন। কিন্তু প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী

মহাশয়ের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই সঙ্গীতে এক নতুন সুরের সন্ধান পান এবং যা আজও তাঁর সঙ্গীত জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আর তা ছাড়া তিনি সুরকার প্রবীর মজুমদারের কাছেও শিক্ষার্থী হিসাবে বেশ কিছুটা ঋণী।

রেকর্ড সঙ্গীত পরিচালনার মাধ্যমেই তাঁর জনসাধারণের কাছে প্রথম পরিচয়। তিনি প্রথম সলিল চৌধুরী এবং সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পীর সমন্বয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভ্যরা যে রেকর্ড করেন, সেই গানের সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত শিল্পীর সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান—শ্যামল মিত্রের 'হংস পাখা দিয়ে' 'ছিপখান তিন দাঁড়' 'চোখ আর মন'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের—'সোনালী রূপালী চন্দ্রকলা' ও 'তোমার ও মনমহুয়া।' মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের—'মুক্ত ছড়া নেইকো কন্যা' 'সেই চোখ কোথায়' 'এই নিরিবিলি স্বর্ণালী'। সতীনাথ মুখার্জীর—'তুমি যেবলা দিনের নীল আকাশের।' সুধীর সেনের—'সন্ধ্যা লগনে' 'চাঁদ তুমি এত' 'মোনালিসা' 'নগরজীবন' 'না হয় থাকলে কিছুক্ষণ' 'তুমি বলেছিলে' 'তোমরা আমার গান শুনে।' আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'বলেছিলে তুমি গান শোনাবে' 'আগডুম বাগডুম' ছড়ার গান। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের—'সাতনরী হার দেবো' 'মন মধুকর যা উড়ে যা' 'কপালে সিঁদুর সিঁদুর' 'হাজার মনের ভীড়ে' 'তোমার প্রথম লেখা প্রেমলিপি' 'আমি ভাবি' 'সাগরতীরে একলা বসে আজি' 'ভেবেতো পাইনা' 'হাওয়া এসে খোঁপাটিকে।' তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'পান্নাহীরা' 'দোলদোল চতুর্দোলায়' 'তোলপাড় তোলপাড়' 'ম্যাগনোলিয়া আর ক্যামেলিয়া' 'ওই জানলা দিয়ে তাকিয়ে' 'না, না, যাসনে পাখী।' নির্মলা মিশ্রের—'তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা' 'ওই আকাশে ক্লান্তি নেই।' সনৎ সিংহের—'রথের মেলা' 'নাগরদোলা' 'দুর্গোৎসব' 'রাধার মন নিয়েছে চুরি।' ইলা বসুর—'একটি দিনের চেনা।' গায়ত্রী বসুর—'পারুল পারুল শিমূল শিমূল'

'মোর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না' 'মেঘ মেঘ কত মেঘ করেছে আজ' 'তুমি আমার নিত্যকালের।' অরুণ দত্তের—'তোমার ঐ সাগর চোখে' 'দূরের থেকে তোমায় দেখে।' জপমালা ঘোষের—'ঝুটি বাঁধা কাকাতুয়া' 'ঝাঁউ কুড় কুড় ঝাঁই নানা' 'চড়ুইভাতি' 'অজগর আসছে তেড়ে।' বাসবী নন্দীর—'এ শুধু তোমার' 'কেন দুটি মন।' উৎপলা সেনের—'এত মেঘ এত যে আলো' 'চাঁদ কি ঘুমিয়ে পড়েছে' 'পত্র লিখেছো চেনা চেনা আখরে' 'এই রিমঝিম বৃষ্টি'।

এছাড়া তাঁর দেয়া সুরে যেসব শিল্পী কণ্ঠদান করেছেন—ঁপান্নালাল ভট্টাচার্য্য, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মৃণাল চক্রবর্ত্তী, মৃণাল গাঙ্গুলী, আলো রায় ও দিলীপ রায়চৌধুরী।

শুধু তিনি সুরকারই নন। ১৯৬৭ সালে তিনি আকাশবাণীর গীতিকার হিসাবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—"আপনার জীবনে কোন হতাশা বা আনন্দের ঘটনা আছে কিনা যা আপনার মহৎসৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করেছে?"

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—"শিল্পী জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, সামগ্রিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা। ঘাতপ্রতিঘাত ও তার প্রতিচ্ছবিকে এড়িয়ে কিছুতেই শিল্পী এগোতে পারে না। আর সৃষ্টিশীল শিল্পীদের ক্ষেত্রে সেই সব যে কোন পাওয়া এবং হারানোই হচ্ছে পথ চলার পাথেয়, সৃষ্টির উৎস। কাজেই হতাশা বা নিরাশা আশা কি আনন্দ তার আলাদাভাবে কোন সত্ত্বা আমার কাছে ধরা দেয়নি—সেগুলো আমার সঙ্গীত জীবনের প্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে গেছে। যার ব্যাখ্যা আমার শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। যদিও ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে শিল্পী জীবনের প্রকাশের জন্যে আমাদের চিন্তাধারার ধারাবাহিকতা অনেক সময় কুয়াশাচ্ছন্ন।"

তারপর প্রশ্ন করলাম—"ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে পাশ্চাত্য সুরের যে মিশ্রণ ঘটেছে, এ সম্পর্কে আপনার কি মতামত?"

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি জোরালো ভাষায় বললেন—

"অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন এমন কোন কিছু আজ পৃথিবীতে নেই যা জাতীয় চেহারা ও চরিত্র বজায় রেখে আন্তর্জাতিক প্রকাশের সঙ্গে কাঁধ না মিলিয়ে চলতে পারছে। আজ ভারতবর্ষের রাস্তায় খেতে না পাওয়া মানুষের উত্তর তৈরী হচ্ছে ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে। চলচ্চিত্রে ইটালিয়ান স্টাইলে ছবি তোলা হচ্ছে, মার্কিনী কায়দায় অভিনয় হচ্ছে। আর যান্ত্রিক কলা কৌশলের তো তুলনাই চলে না—তার পুরোটাই যত বিভিন্নদেশীয় ততই উন্নত। কাজেই সঙ্গীতকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আর বাঁচানো যাবে না। আমাদের দেশে যশস্বী সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় মস্ত ওস্তাদ বলে, সার্থক শিল্পী হিসাবে নয়। সেদিনের শেষ হয়ে এলো। দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সারা পৃথিবীতে যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে, তার সমাজগত, সংস্কৃতিগত, অর্থনীতিগত, রাজনীতিগত চেহারা আন্তর্জাতিক। কাজেই সম্পূর্ণ জাতীয় সত্ত্বা বজায় রেখে সঙ্গীতেরও সেই অগ্রগতির থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার উপায় নেই। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু প্রয়োগ প্রণালীরও বদল হবে। Indian Melody পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। তাই সেই Melodyর প্রয়োগ প্রণালী আগামী দিনের পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের সর্ব সময়কার চিন্তার প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।"

'Philosophy of your Music' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন—"ওপরের লেখা দুটি point থেকে আশা করি আমার সঙ্গীত জীবনের মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মত, পথ ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটাতে পারছি না।"

অবশেষে চলচ্চিত্রের সঙ্গীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন—"Film music is a sense of purspective." কোন একটি বিরাটকায় পুরুষের পেছনে সানাই বাজালে audio ও visual vaint এর Co-ordination হয় না। Film Music

সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। তবে ওপরের দুটো কথার দ্বারা বেশী কিছু বলবার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলবো বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রে যে সঙ্গীত হচ্ছে তার বেশীর ভাগই বাজনা বাজার দোষে দুষিত কিন্তু চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার অঙ্কণ।"

গীতি গুচ্ছ

রচনা

অঞ্জন কুণ্ডু

আধুনিক গান

(১)

শিল্পী জীবনের কত ব্যথা
জান্‌তে চাহেনা কেহ ধরণী পরে ;
সকলের মনে দিয়ে আনন্দসুধা
শিল্পী শুধুই সে যে কেঁদে কেঁদে মরে।

সিক্ত চোখের জলে গেঁথে
শূন্য হৃদয় ভরে দিতে,
ক্লান্ত পাখীর মত সব খুশী বিলিয়ে
শিল্পী সে ফিরে আসে রিক্ত ঘরে॥

শিল্পীর মূল্য সে কে দেয় বলো ?
তারো ব্যথা আছে জেনে কবে কার আঁখিদুটি
বেদনা হয় ছল ছল !

শিল্পী যে প্রদীপের মত—
ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যায় অবিরত।
নিজেকে নিঃস্ব করে মুঠি মুঠি আলো নিয়ে
বিলোয় সে সব ঘরে—ঘরে॥

(২)

সূর্য্যমুখীর মন ছুঁয়ে এই মিষ্টি সকালে,
উধাও এ মন দোল দিয়েছে হাল্কা মেঘের পালে।

পাখীর পাখায় দোদুল দুলে
রঙীন রঙীন নানান ফুলে,
খুশী যেন হাত ধরে মোর সেথায় ঘোরালে ॥

নিত্যকারের দুঃখকে তাই
বল্‌ছি আমি ডেকে—
আজকে শুধু দাওনা ছুটি
সকল ব্যথার থেকে।

কেমন যেন হঠাৎ আমার,
হৃদয় নদীর উতল দুধার,
ঢেউ লেগেছে ভাঙা মনে খেয়ার ভাঙা হালে।

(৩)

কখনো কখনো মনকে আমার
ও-আকাশ মনে হয়—
যে আকাশ দেয় সোনার আলো
আবার কুয়াশাময়।

খুশী কাড়ে মন ফোটা ফুল থেকে,
ব্যথা বুকে পায় ঝরে যাওয়া দেখে,
রোদবৃষ্টির হাসি হাসে মন
কান্নাকে বুকে সয় ॥

ভোরের আলোর জন্যে আকাশ
যেমনটি বসে থাকে,
তোমার আসার আশায় তেমনি
এ-মনও স্বপ্ন আঁকে।

অঝোর ধারার আকাশ যেমন,
তুমি হারা মন কাঁদে যে তেমন,
তুমি কাছে এলে শরৎ আকাশ
সাদা মেঘে ভরে রয়॥

(৪)

কেন নীরব রইলে কিছু কথা যদি বল্‌তে,
নাইবা ঘরেই এলে সাথে পথ যদি চল্‌তে।

না হয় মনের ঘর রইল আঁধার,
খুশীর দিনটি নয় হলই কাঁদার,
দীপ না জ্বালো, প্রেমের আগুনে
পাবতো নিজে জ্বলতে॥

না হয় চলেই যাবে কিছু কাছে যদি থাক্‌তে—
ভুলে তো যাবেই যদি আজ কাছে ডাক্‌তে।

না হয় রিক্ত সেই জীবন হবেই—
সাথীহারা মনে ব্যথা তো রবেই!
মনে না রাখো, আঘাতও তো দিতে পারো
হৃদয় দল্‌তে॥

(৫)

মন যেন মোর ময়ূরপঙ্খী
তোমার আঁখির সাগরে।
পাল তুলেছে উধাও হাওয়ায়
যাবেই সে রূপনগরে।

নামুক না ঢল বাদলে,
মেঘ গুরু গুরু মাদলে,
অনেক আশার হাল ধরেছি
কুয়াশা যাবেই সরে॥

রূপনগর ঐ আঁখি তোমার
তীর জানা তার নেই।
করবে না ভয় এ-মন আমার
কোন বাধাকেই॥

হোক না আঁধার আকাশে,
বাদল ঝির্-ঝির্ বাতাসে,
আঁখির কূলে ভিড়বে খেয়া
বলবে, "কন্যে, জাগরে।"

(৬)

মনের মুকুরে যারে দেখি—সে কি তুমি ?
রাতের স্বপনে যে ধরা দেয়—সে কি তুমি ?
সে কি তুমি ওগো সে কি তুমি॥

ধরা দিলে যদি প্রাণে
প্রহর ভরাও গানে গানে,
আঁধার ভাঙানো আলোতে রাঙাও উসর এ মরুভূমি
শুধু তুমি ওগো শুধু তুমি ॥

সে কি তুমি ?
জীবন-মরুতে ছড়ালে সজল বরষার মৌসুমী।

বাতায়নে দখিন হাওয়া
কভুই করে আসা-যাওয়া,
রূপালী এ রাতে চাঁদের জোছনা ধরণীরে যায় চুমি.
কোথা তুমি ওগো কোথা তুমি ॥

(৭)

তুমি, আসবে বলে ঘাসের বুকে
শিশির ঝরেনি—
পথ, চিন্‌বে বলে আকাশে চাঁদ
ঘুমিয়ে পড়েনি।

ফুল বলে আর কত প্রহর—
গুন্‌বো, চোখে ঘুমেরই ঘোর,
আর, শেষ রাতের ঐ হিমেল হাওয়া
রাতের আবেশ ভরেনি ॥

শিউলিগুলো কখন ঝরে'

পথটি ভরে ছিল—

হাসনুহানার শেষ সৌরভ

হাওয়ায় মেলে দিল।

দীপ বলে আর পারছি না যে—

বিদায় নেবার ঘণ্টা বাজে।

মোর, নয়ন দুটি ব্যাকুল আশায়

পথ-চাওয়া শেষ করেনি॥

(৮)

তুমি তো আকাশ নও,

কেন আকাশের মত দূর-দূর হয়ে থাকো?

তুমি তো আলেয়া নও

তবে দেখা-অদেখায় মুখ কেন ঢেকে রাখো?

আমি জানি তুমি নদী—

আপন ছন্দে খুশী তরঙ্গে বয়ে চলো নিরবধি।

তুমি তো সে ফুল নও,

যেথা কাঁটারই আঘাত

সৌরভ পাবো নাকো।

মেঘের আড়ালে আকাশ কি কভু

নিজেকে লুকোতে পারে?

হাসি দিয়ে কবে ঢেকে রাখা যায়

হৃদয়ের বেদনারে।

আমি জানি তুমি আশা—
অথৈ স্বপ্নে উতল আনন্দে ভাঙা মনে আনো ভাষা
তুমি তো অবুঝ নও,
তবে সবুজ মনকে
ভুল দিয়ে কেন ঢাকো ॥

(৯)

মেঘলা দিনে তোমায় বিনে
একলা বসে ঘরে,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি দেখে
মন যে কেমন করে।

আমার ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে
শ্রাবণ যেন কাঁদে ;
সেই সুরেতে বাদল বীণা
মেঘমল্লার সাধে।
এসব কিছু ছাপিয়ে শুধু
তোমায় মনে পড়ে ॥
নয়ন দুটি আকাশ হয়ে বৃষ্টি ঝরায় যে,
তোমার মনের মাটি বুঝি সিক্ত করায় সে।

তোমার বুকের দুরু দুরু
মেঘ গুর্ গুর্ করে,
মনের শিখা বিজলী যেন
চম্‌কায় অম্বরে।
তাই তো এ মন গুন্‌ছে প্রহর
তোমার আসার তরে ॥

(১০)

চোখ দুটিই তো কাজল কালো তোমার
কেন আরো কাজল তবু পরো।
ফুলের মত নিজেই তুমি তো গো
তবে কেন ফুলের খোঁপা করো?

তোমার হাসি বিজলী যেন সেতো
কি হবে তাই প্রদীপ জ্বালা এতো,
কি কাজ বলো ঠোঁট দুটি আর রেঙে
অভিমানে সে নিজেই থরো থরো॥

কনকচাঁপা বরণ দুটি হাতে
কাঁকনকে আর লজ্জা কেন দাও।
তোমার ঐ ঝলমলে রূপ থেকেও
কেন আর মুক্ত মালা চাও?

দুটি পা আপনি সেতো রাঙা
তবে আর আলতা কেন টানা।
হৃদয় ভরা রামধনু রং নিয়ে—
নকল রঙে অঙ্গ কেন ভরো?

(১১)

এ কথা ভাবিনি কোনদিনই আমি
তুমি তো আমার নও॥
এ-জীবনে একি শেষ দেখা ওগো
একবার শুধু কও?

মিছে তবে এতো গান,
ব্যথা ভরা অভিমান,
কেমনে সইবো তুমি যদি দূরে রও ?

আশার স্বপনে বুক বেঁধে আমি
তবু দিন গুণে যাবো ;
শত জনমের সাধনার শেষে
তোমাকেই ফিরে পাবো।

মোর পানে ফিরে চাও ;
কোথা যাবে বলে দাও।
আঁখিজলে গাঁথা মালাখানি তুলে লও॥

(১২)

আহা ঝিরি ঝিরি বারি ঝরে,
জানিনা কাহার তরে,
তাই বুঝি থেকে-থেকে
মনও কেমন করে।

শ্রাবণের ধারা বুঝি এল মোর জীবনে,
ফাগুন বিদায় নিয়ে গেছে বুঝি গোপনে,
বেঁধেছে হয় ত বাসা
আর কারো অন্তরে।

সে অন্তর হয়ত বা তোমারই—
মধুমাস তোমারই বনে,
এখানে অশান্ত হাওয়া
দুরু-দুরু চকিত মনে।

জানি না এ ব্যথা মেঘ—সেথা কি গো জম্‌বে,
এ আকাশ এ বারতা সেথা কি সে বল্‌বে?
বসন্ত আর কি সে
ফিরবে এ ভাঙা ঘরে॥

(১৩)

বধূ তোমার মধুর হাসি
দেখতে আমি ভালবাসি।
তাইতো কোথাও না তাকিয়ে
তোমার কাছেই ছুটে আসি।

তোমার ঐ হাসির টানে,
ভেসে চলি মন উজানে,
যেথা আছে দু'চোখ ভরা
সোনার খুশী রাশি-রাশি॥

(এই) দুদিনের আসা যাওয়া,
কাঁদা হাসা চাওয়া-পাওয়া;

তোমায় পেলে সবই আছে,
স্বর্গ যেন হাতের কাছে,
হারিয়ে তোমায় মনে হবে
ফোটা ফুলও অনেক বাসি ॥

(১৪)

আঁখি জলে আর পথ চেওনা—
দুদিনের এ জীবন নিরাশার সুরে-সুরে
মিছে তুমি আর ওগো ছেওনা !

স্বর্ণালী আকাশের গায়
তারাগুলি যদি নিভে যায়,
সোনালী উষার গানে বুক বেঁধে নিও তবু
বকুলের মত ঝরে যেও না ।

কিছু চাওয়া কিছু পাওয়া—
এরই মাঝে এ জীবন !
নদী যেন কোথা থামে
কোথা হয় উন্মন ॥

চৈতালি ঘূর্ণি হাওয়ায়—
আশা খেয়া যদি ডুবে যায়—
দুঃস্বপনের সুরে এ হৃদয় ভরে' নিয়ে
বিষাদের গান ওগো গেওনা ॥

(১৫)

আমার, শূন্য জীবন ভরে দেবে বলেছিলে॥
কখনো দুখের মেঘ জম্‌বে না
আমার মনের আকাশের নীলে।

পথ ভোলে যদি মনের এই নদী—
সাগরের মত হাতছানি দিয়ে—
ডেকে ডেকে নেবে তুমি নিরবধি।
আঁধারে হবে গো প্রদীপের শিখা
পদ্ম হবে গো মনের এই ঝিলে॥

এমনি করেই কাট্‌লো প্রহর
কত কথা দেয়া-নেয়া
সময়ের যত ঘাট হতে ঘাটে
ফিরলো জীবন খেয়া।

তারপর এক গোধূলির সাঁঝে,
চোখ তুলে দেখি বিদায় চাইছো
চলে যাবে বলে নববধূ সাজে
ফাগুনের শেষ কড়িটুকু নিয়ে
শ্রাবণকে চিরতরে এনে দিলে॥

(১৬)

হলুদ শাড়ী পরনে তার,
কণ্ঠে পরা মুক্ত হার,
আলোর রঙে রাঙিয়ে দিল
আমার মনের অন্ধকার।

আকাশ নীলে দু'চোখ ছেয়ে,

আঁকা-বাঁকা পথটি বেয়ে,

বনের কুহু-কুহু তানে

ভরালো রিক্ত মন আমায় ॥

পাখীর স্বরলিপি নিয়ে

কথা যে তার সাজানো—

চলন যেন ঢেউয়ের নূপুর

ছন্দে-ছন্দে বাজানো।

তাইতো মনের মতন করে,

রাখতে যে চাই এ অন্তরে,

প্রাণের পরশ উজাড় করে

দেব যদি সে হয় আমার ॥

(১৭)

তাই তো আবার তোমায় চিঠি দিলাম

যদি আমায় নতুন নামে ডাকো।

কিন্তু, আজও তার জবাব পেলাম না

কেন এমন দ্বিধায় বেঁধে রাখো ?

আমার মনের কথা লিখেছিলাম

কবিতারি ছন্দে,

ফাগুনের ঐ মাতাল হাওয়ায়

উতল যূথীর গন্ধে।

একটু কথা লিখে দিও

যদি আমার থাকো ॥

ভেবেছিলাম তুমিই শুধু আমার,
তাই তো আমি চিঠি দিলাম আবার।

তবে কি মোর চিঠির পরে
ঠিকানা ভুল হল!
আমার আশা মাঝ পথেতে
সেকি হারিয়ে গেল
কি জানি কি অদৃষ্ট মোর
ভুলটি বুঝো নাকো॥

(১৮)

এই সেই মায়াভরা সন্ধ্যা
যখন তুমি ছিলে কাছে;
কত কবিতা আর উপমা যে
পেয়েছিনু তোমার মাঝে।

দুজনা দুজনাকে পেয়ে
মন গান উঠেছিল গেয়ে,
ভয় বাসা বেঁধেছিল মনে
যদি বা হারাতে হয় পাছে॥

তুমি আজ কোথা আছো জানিনা,
আজকের এ সন্ধ্যা মায়াভরা কিনা!

হয়ত বা কিছুই না পেয়ে
ক্লান্ত পাখীর মত চেয়ে
আকাশের নীল-নীলে ভেসে,
চলে যাবো, মন যেথা আছে॥

(১৯)

রাতের আঁধারে কেন গো আমায়
সুরে-সুরে কাছে ডাকো—
বেদনার মালা পরাতে চাও তো
কাছে আর ডেকো নাকো।

যেতে-যেতে পথে আঁধারে একেলা
হারিয়ে ফেলি যে পথ,
কেঁদে-কেঁদে মরি সেই গান শুনে
যে গানে করেছি শপথ ;
সে গান হাসিতে ঢাকো ॥

যদিও তোমায় চেয়েছিনু শুধু গানে-গানে,
বুঝিনা কেন যে সে গান শুধু বেহাগের সুর আনে।

হয়ত মোদের মিলন রজনী
ভরে' ছিল অভিশাপে,
তাইতো আকাশ নীল নয় ওগো
বরষার মেঘ কাঁপে !
তাই যদি কাছে থাকো ?

(২০)

অস্তরবির ঐ সোনালী আলোয়
চেয়ে দেখি মেঘমালা কোন্ দেশে যায়—
সেথা কোন মেঘবতী আছে প্রতীক্ষায় ॥

দূরের ঐ নীলাকাশে সুগভীর বিস্ময় ;
মেঘমালা তোমাকেই করেছে যে মধুময়,
আমার এ-মন সেথা ভেসে যেতে চায় ॥

হয়ত বা দুটি প্রাণ এক সুরে বাঁধা রয়,
যত দূরই হোক্ না সে তত কাছে মনে হয়।

রামধনু সে পথের সীমানা আঁকে,
মেঘবতী কন্যার পথের বাঁকে
আমার মনের দিশা পথ খুঁজে পায় ॥

(২১)

দুটি মন
কিছুক্ষণ
এ কথাই ভাববে —
পৃথিবীটা গদ্য না হয়ে যদি কাব্যে
লেখা হত ?
সেই মত
ভাব্‌তো হৃদয়েতে উঠবে নাম্‌বে ॥
চোখ দুটো অবাধ্য
দুটি চোখে পড়বেই ;
হাতখানি খুঁজে খুঁজে
আর এক হাত ধরবেই ;
মুখ সেতো বলবেই উত্তর না পেলেও
ও মনের সাড়া কত মাপ্‌বে ॥

হৃদয় সে জানে আর এক হৃদয় কি চায়
অধরার ছলে শেষে বাঁধনে বাঁধায়।

হাসি জানে রাজত্ব তার
একলার শুধু নয়,
কান্নারও আছে দিন
বদ্‌লে যাওয়ার ভয়;
মনও সে বসে থাকে কবে সব শেষ হবে
স্মৃতিগুলো হৃদয়েতে ছাপ্‌বে।

(২২)

আজি, তোমার আমার মিলনরাতি
কত সুন্দর কে জানে!
মিলনবাঁশী বাজায় কে গো
তাই কি মধুর তানে!

সেই সুরে মন উতল হল
দোদুল ছন্দে,
হাসনুহানা, ভুঁই চাঁপা আর
বকুল গন্ধে
মন মাতানো গানে॥

তাই তো আমি তোমায় বলি,
সব যেন আজ গানের কলি।

সেই ছোঁয়া আজ পেয়ে মনে

হলাম দিশাহারা

অন্ধ হল দুটি আঁখি

মুগ্ধ পাগল পারা

চেয়ে দোঁহার পানে॥

(২৩)

আমি তো তোমায়

ভুল করে ভালবাসিনি, না-না-না—

তোমার দ্বারেই এসেছি,

বিদায় কখনো নিতেতো আসিনি, না-না-না।

প্রহরে-প্রহরে কেটে গেছে রাত

কেটে গেছে কত দিন—

তিল-তিল করে এ মন আমার

তোমাতে হয়েছে লীন—

পাবো কি পাবো না হিসেবের মাঝে

তবু আঁখি জলে ভাসিনি, না-না-না।

কি অপরাধ জানিতাম যদি আমি,

ভুল ভাঙাবার সে পথেই ওগো

হতাম আমি অনুগামী।

ভ্রমরে-ভ্রমরে কত কানাকানি—
ফুলে-ফুলে কথা কয়,
আমার জীবনে ফাগুন মরেছে
শুধু ধূ ধূ মরুময়।
সব জ্বালাকে তুচ্ছ করেও
প্রাণভরে কভু হাসিনি, না-না-না॥

(২৪)

চাঁদনি রাতের মায়াভরা গানে,
সজনী আমায় বাঁধে সেই তানে।

বলে গো সজনী, যেওনা এখনি,
আকাশের চাঁদ পথ গনি-গনি
রয়েছে সে আস্‌মানে॥

জোছনা এখনও রয়েছে যে ফুটে,
(তাই) হৃদয়ের প্রেম মোর জেগে ওঠে;

সজনী যে বলে, জলভরা চোখে যেওনা,
এমন মিলনে বিরহের গান গেওনা,
মরে যাবো অভিমানে॥

(২৫)

মন-মধুপ গুঞ্জনে
যে সুর এলো মোর মনে,
তোমাকে শোনাতে চাই একান্ত নির্জনে।

নীল-নীল হলো আকাশ

সে বারতা জান্‌তে পেরে গো,

খুশীতে পলাশ রাঙা

আকাশ পানে একটু চেয়ে গো,

দখিণা, বাজায় বীণা, সুরে লীনা

আজকে শুভক্ষণে ॥

জানি গো অনেক সয়ে, কতদিন গেছে বয়ে—

আজকে তুমি আমি একটি প্রাণ।

নদী তাই বাঁধন হারা পেয়েছে মনের সাড়া

কুলু-কুলু ছন্দ তুলে গাইছে গান ॥

যে ফাগুন আসবে বলে

প্রতীক্ষাতে গুণছিল প্রহর।

সে যেন ধরা দিল আজ সহসা

সপ্ত সুরে মোর।

এ গানে, স্বপ্ন আনে দুটি প্রাণে

খুশীর নিমন্ত্রণে ॥

(২৬)

তুমি আর আগের মতো নেই।

কত না গানে গানে বলেছিলে—"ভালবাসি'

কত কথা দেয়া-নেয়া কত খেলা কত হাসি।

ভুলে গেলে, দূরে গেলে যেই ॥

মন থেকে মোর নাম মুছলে কি করে— ।
যাকে তুমি ডেকেছিলে প্রিয় নাম ধরে—
ভুলে গেলে এতো সহজেই ।

ও চাঁদ মিথ্যে হল ঐ মধু তিথি—
এই তো সেদিন ছিলে আজ হলে স্মৃতি ।
ভুলে গেলে কিছু না চেয়েই ॥

(২৭)

তোমার ঐ হাসির মহিমা
দেখি যেন শরৎ কাশবনে,
তোমার ঐ রূপের তুলনা
মেলে যেন চাঁদের দর্পণে ॥

তোমার ঐ রূপের গরব যেন ফুটে ওঠে
নূপুর চলা ছন্দে—
তোমার ঐ কেশের সুরভি যেন খুঁজে পাই
বনযূথীর-গন্ধে ;
তোমার ঐ ডাক শুনি যেন
ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে ॥

খুঁজে পাই তোমার গাওয়ার সুর
মিষ্টি গলায় একান্ত নির্জনে,
যেন চকিতা হরিণী চলে যায়—
তুমি যখন চলো গো আনমনে ।

তোমার ঐ রং বে রং এর চুড়ি
যেন রামধনুকের মত,
আমার এই রিক্ত মনের দ্বারে আনে
স্বপ্নসুরভি শতশত।
আমি যে যোগ দিতে চাই
তোমার ঐ খুশীর অঙ্গনে॥

(২৮)

সারি-সারি ঝাউবন দুল্‌ছে
আঁকা যেন রঙীন ছবি।
আমার মনেতে ঢেউ তুল্‌ছে
তাই আমি আজকে কবি॥

মাঝে-মাঝে কত দিন গুনেছি,
স্বপ্নের জাল কত বুনেছি,
যদি এই মায়ারাতে—
হাত দিতে মোর হাতে—
আরো মধুময় হ'তো সবি॥

ঝিল্‌মিল্ দূরের ঐ আকাশে,
দিশাহারা মন আজ বাতাসে—
তুমিও আমার মত।
চাও কি গো অবিরত
আমার মনের ভৈরবী॥

(২৯)

আকাশের যে তারা প্রথম আমি দেখেছি
সে যে মোর চেনা ঐ সন্ধ্যাতারা—
যাকে আমি হৃদয়ের মত ভালবেসেছি
যে আজ করেছে মোরে এত দিশাহারা ॥

ও-তারার আলোয় আমি তোমায় চিনেছি,
ভোর হতে দেখি কত দূরে সরে গেছি,
আবার এনেছে কাছে ঐ সেই তারা ॥

হয়ত বা তারার মত জীবনের ভালবাসা যত,
আলোকে কাছে পেয়ে আঁধারে হারালো শতশত।

সন্ধ্যাতারার মত কিইবা তোমার কাছে পাই ?
মনে হয় এ জীবনে এই পেয়ে আর খেদ নাই,
হোক্ সে ক্ষণিক তবু আমি দিশাহারা ॥

(৩০)

অভিমানে লজ্জাবতী রাঙানো ঐ আকাশ,
অনুরাগে মুখর হল দুরন্ত ফাগুন বাতাস।

লজ্জাবতী আবীর মেখে প্রজাপতির পাখ্‌নাতে,
যাবে যেন কোন্ সুদূরে ঈশারাতে মন মাতে,
ছড়িয়ে দিয়ে অসীম অবকাশ ॥

ভ্রমরের গুঞ্জনেতে রয় না এ-মন ঘরের কোণে
পাখীর কাকলী শুনে উধাও যে গগনে।

লজ্জাবতী সে-সুর শুনে নম্র হয়ে দোলে,
কৃষ্ণকলি মাতাল হল সেই না সুরের বলে
বনে-বনে তারই যে আভাস ॥

(৩১)

আমার সুখের রজনীতে ওগো তোমাকেই চাই।
(শুধু) ব্যাকুল হৃদয় কাঁদে তুমি কাছে নাই ॥

দ্বারে গিয়ে ভাবি কোন্ সুরে ওগো ডাকি তোমায়,
হাতে ধরা ফুল হাতের মাঝেই সে যে শুকায়।
জীবনে-মরণে কি করে জানাই
তোমাকে চাই ॥

একেই কি বলে ভালবাসা, না ক্ষণিক আশা ?
মনের তরীটি ছুঁই-ছুঁই করে মাঝ দরিয়ায় ভাসা ?

যত কাছে যাই তবু দূর কেন মনে হয়—
মেঘ কেটে যায় তবু মেঘে কেন পায় ভয়
সব হিসেবের উর্দ্ধে যেন গো
তোমাকে পাই ॥

(৩২)

সাঁঝের বেলায় একটি মুকুল
ঝরতে দেখেছি -
সে তো মনের ভুল নয় গো
বুঝতে পেরেছি।

ঝরা ফুলে যায় না বধূ
মালা যে গাঁথা—
গোপনে প্রেম মনের কোণে
জাগায় কত ব্যথা
বুঝতে পেরেছি ॥

ছুটি হৃদয়ের মিলন যেন নদী ও সাগরে—
একটি হৃদয় হারিয়ে গেল ব্যথায় বালুচরে।

অভিশাপের পেরিয়ে সীমা
যায় না কোথাও যাওয়া—
একটু চাওয়া খুঁজে ফেরে
কোথাও আছে পাওয়া
বুঝতে পেরেছি ॥

(৩৩)

তোমার চিঠি আমার মনে
জাগায় কত আলো,
সেই আলোকের জ্যোতিতে আজ
লাগছে সবই ভাল।

আর কতদিন থাকব বলো তোমার প্রতীক্ষায় ?
মিশবে তুমি কবে আমার এ মন যমুনায় ?
(শুধু) দিশাহারা হৃদয় দীপে
প্রেমের শিখা জ্বালো।

(ওগো) বারে-বারে তোমার চিঠি তাইতো আমি পড়ি,
(আর) মনে-মনে রঙীন আশায় স্বপ্নবাসর গড়ি।

তুমিই যেন ছড়িয়ে আছো তোমার চিঠির কথায়
প্রজাপতির পাখ্‌না যেন রামধনুকের ছটায়
(ওগো) মরুময় এ-হৃদয়ে মোর
প্রেমের সুধা ঢালো ॥

(৩৪)

এ পৃথিবীতে জানি কেউতো আমার নয়।
দুদিনের এই যাওয়া আর আসা,
মিছে মায়া হাসি মিছে ভালবাসা,
তবু সবই যেন আপনার মনে হয় ॥

কি যেন এক যাদু আছে এই মায়াভরা ভুবনে,
প্রিয়া দিতে চায় শুধু প্রেম গোপনে,
আকাশের কানে রাত তাই কথা কয়

আমি যত ভাবি প্রিয়াতো আমারই, আমারই,
কাছে গেলে দেখি উদাসীনা মন তাহারই।

তবুও দুচোখে বাঁচার স্বপ্ন খেলা করে,
যদিও জানি যে স্বপ্ন হারাবে বালুচরে।
ছিড়বে বাঁধন দুদিনের পরিচয় ॥

(৩৫)

আমি তোমায় মনের মত
গান শোনাতে পারিনি—
আবার যদি সুযোগ মেলে
তাইতো আশা ছাড়িনি।

সেদিন দেখা সপ্তসুরের মালা গেঁথে—
তোমার তরে রইবো বসে আসন পেতে।
আস্‌লে তুমি আমার প্রাণের জলসাঘরে
দেখ্‌বে হবো তোমার স্বপ্ন চারিনী॥

আমার প্রাণের বাণী সেদিন সুরে মধুর হ'বে,
আমার মনের গোপন কথা তোমার কাছে কবে।

সেদিন দেখো তোমার মনের মতন করে',
গান শোনাবো আমার সারা হৃদয় ভরে'।
সেদিন তুমি অবাক হয়ে দেখ্‌বে চেয়ে,
দেখবে আমি তোমার কাছে হারিনি।

(৩৬)

বনের ঐ প্রান্ত থেকে
কত পুষ্প গন্ধ ভেসে আসে ;
হৃদয়ের অন্তরে তাই
তোমার মুগ্ধ মুখখানি শুধু ভাসে॥

পুষ্পের সুরভি যেন তোমাকে পাওয়া—
পুষ্পের মাধুরী যেত তোমায় চাওয়া ;
তারি গুঞ্জর যেন আকাশে বাতাসে।

সে কথা ভেবেই মন হয় দিশাহারা ;
হৃদয়ের ভালবাসা তাই দেয় সাড়া।

সে সুরের রেশ নিয়ে নিঝুম সন্ধ্যায়,
পাখী তার দিন শেষে নীড়ে ফিরে যায়
মধুময় হয় ক্ষণ তারি সে আভাসে।

(৩৭)

আমার মনের আলো
জোনাকির আলো যেন জ্বলে আর নেভে—
আশা নিরাশার দোলা
কি পাবো কি হারাতে হবে চলেছি ভেবে।

যখনি হয়েছে মনে ছুটে যাই তোমার মনের কথা জান্‌তে
কে যেন বলেছে ডেকে, সে কথাই প্রশ্ন করো নিজেকে একান্তে।
ভুলে গেছি তাই
কোন্‌ তিথিতে তুমি বলেছিলে ধরা দেবে।

এ আশা স্বপ্ন যেন এই মেঘ এই দেখি রোদ্দুর
তাই বুঝি কাছে পাওয়া, পেতে-পেতে দেখি বহুদূর
তাই শুধু দিন গোণা
কবে তুমি মনে করে কাছে টেনে নেবে।

(৩৮)

কনক চাঁপার বনে আর আমার প্রিয়ার মনে
ভরতে যে চাই মুঠি মুঠি মধুর স্বপনে।

তাইতো সলাজ অভিমান,
ফাগুন বাতাসে হবে অবসান।
বসন্তেরই যত গান
হারাবে মনের গোপনে॥

হৃদয়ের সঞ্চিত কথা —
শোনাবো তোমায়, ভাঙো নীরবতা,

ঐ যে আঁখিতে এত আশা —
তারই এক কোণে খুঁজে পাই ভাষা
তাই চাই ছোট্ট একটি বাসা
খুশীভরা আয়োজনে॥

(৩৯)

সাগর তীরে ঝিনুক কুড়াতে
কত যে মধুর লাগে ;
যদি তুমি থাকো আশে-পাশে।

হৃদয়ের পরে তোমাকে আঁকতে
কত সে যে সাধ জাগে।
যদি তুমি থাকো মধুমাসে।

ঝিনুক কুড়িয়ে হাতে তুলে দিতে দিতে,
ভাবি এই সাথে মন যদি চেয়ে নিতে
নিবিড় সে অনুরাগে,
শুধু একান্তে অবকাশে।

এত রূপ এত প্রেম দেখিনিতো কভু
তুমি ভুল্‌লেও, তোমারি রবগো তবু।

ঝিনুকের চেয়ে মনটাকি বড় নয়?
ভেঙে দাও ওগো এই ভীরু সংশয়?
এ মন মিনতি মাগে।
শুধু তোমায় পাওয়ার আশে।

(৪০)

পুরানো স্মৃতির পটে
ভেসে আসা তব নাম
আমি লিখে যাই, শুধু লিখে যাই।

হাসি খেলাছলে
আর আঁখিজলে
আমি রেখে যাই, শুধু রেখে যাই
মোর ভালবাসা
তুলে নিও তাই॥

কোনদিন অবসরে
যদি ওগো মনে পড়ে
মনের অতলে রুদ্ধ সে-ঘরে
ফেলে রাখা যত স্মৃতির কাগজে-
যদি পড়ে যায় কখনো নজরে।
স্মৃতির গভীরে তুলে রেখো তাই।

আবার মিলায়ে দেখে নিতে পারো
সেদিনও দেখবে হোক ছেঁড়া তারো
পাতায় স্পষ্ট লেখা আছে তাই—
তোমার আমার জীবনপ্রান্তে
যতদূর চলে যাই ॥

(৪১)

ওগো বন্ধু, তুমি যে আমার কত আপনার
বোঝাব বলনা কি করে ?
ভালবাসা কেন আমারে কাঁদায়—
বিফল রাতে অঝোরে ॥

এ জীবনে যদি তোমাকে না পাই,
কাঙালের মত কেন তবে চাই ?
সব চাওয়া সেতো পাওয়া হয় নাগো
জীবনের বালুচরে ॥

মনে হয় এই ভালবাসা যেন ধূপের মত,
ক্ষয়ে-ক্ষয়ে শুধু বিলিয়ে দিতেই রত।

এ জীবনে যদি সাথীহারা হই,
সে ব্যথা আমার একা যদি বই,
তবুও জেনোগো আর কারো নেই
ঠাঁই এই অন্তরে ॥

(৪২)

পদ্মের সুন্দর গন্ধে
ভ্রমরের গুন্ গুন্ ছন্দে
আমিও চাই গো যেতে
সুরের ঐ রঙীন ভেলায়।

কোন্ বাতাসের দোলনায়
মধু আহরণে ওরা ধায় —
আমিও ওদের মত চাই গো যেতে
আমার খুশীর তুটি পাখ্‌নায়॥

সবই স্বপ্ন সব ছলনা !
আমার পাখ্‌না কোথা বলনা ?
সব আশা বুকে চেপে বইতে হবে
মায়ায় রুদ্ধ করা এ ধরায়॥

(৪৩)

খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আমি
ভাবি শুধু—
তোমার খেয়া ঘাটে কবে
ভিড়বে বধূ ?

দূর পাহাড়ের কোলে দেখি তাল ও দেবদারু
পেরিয়ে যেতে পারব কি গো তোমার মনের মরু
ওগো পরাণ বধূ !

আশা ছিল তোমার মনের
দেখবো কত দেশ
কত খুশীর কত আশার
রূপের নেইকো শেষ।

দূরের ঐ নীলাকাশে শুধুই চেয়ে রই—
হয়ত তোমার ডুবলো খেয়া জল সে যে অথৈ
ওগো নিঠুর বধূ॥

(৪৪)

সেদিন তো তুমি
কত কাছে ছিলে,
কেন চলে গিয়ে
মনে ব্যথা দিলে!

বোঝাতে পারিনি
কি যে পেতে চাই,
বলি-বলি করে
বলা হয় নাই,
ভুলকেই তুমি
কাছে টেনে নিলে!

তোমার যে চোখে খুশী ভরা ছিল,
কে বলো সেথায় জল ভরে দিল?

কি এমন ভেবে
দূরে সরে গেলে,
দূরে গিয়ে যেন,
কাছে আরো এলে,
আরো ঘন হলে
মনের নিখিলে ॥

(৪৫)

গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে
সোনার কাঁকন নাড়িয়ে,
উদাস-উদাস ছুপুরে
কোথা যাও মোরে কাঁদিয়ে।

সোনা ঝরা ঐ ছুপুর বেলায়,
আমাকে মাতিয়ে অলস খেলায়,
রিক্ত দিনের স্তব্ধতা নিয়ে
কোথা যাও মোরে কাঁদিয়ে ॥

বিদায় বেলায় মিনতি রইল শুধু ;
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে এসো গো বধু।

দীঘল ও-ছুটি আঁখির সাগরে,
পাড়ি দেবো ভালবাসা-খেয়া করে'—
সব আশাটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
কোথা যাও মোরে কাঁদিয়ে ॥

(৪৬)

আন্‌মনা মনে

এলোমেলো সাজে—

কোথা যাও ওগো বল না?

এ কি লাজ, নাকি ছলনা!

ঐ আঁখি দুটি যেন দুটি পাখী,

উচ্ছল ডানা যেন থাকি-থাকি।

রিক্ত এ-মন সাথে করে নিয়ে চলোনা॥

হয়ত তুমি ঝর্ণারি মত—

খুশী আনন্দে ছোট অবিরত।

অন্ধ এ-মনে আলো হয়ে কেন জ্বলো না?

(৪৭)

আমার মন কাঁদেরে

শুধু কাঁদে, কেন কাঁদে

বল্‌তে চায় না যে রে॥

দুনয়নে জল দেখে

কেউ তো ভাবেনা;

কারে শুধু চায় মন

কেউ শুধাবে না!

তাই, একা একা আনমনে

মন শুধু কাঁদেরে॥

কাউকে জীবনে চাওয়া
সে কি অপরাধ !
তিলে-তিলে পুড়ে যাওয়া
জীবনের সাধ ?

এতো করে চেয়ে মন
কিছুই পেলো না,
কথা দিয়ে চলে গিয়ে
আর তো এলো না
তাই, সব কিছু বুকে সয়ে
মন একা কাঁদেরে ॥

(৪৮)

এ পৃথিবীতে সবাই যে আজ
শিল্পী হতে চায়—
তা কেমনে হয় ?
সাধনা বিনা শিল্পী হওয়া
সে তো সহজ নয় !

শিল্পী যদি কেউ কোনদিন
হতে পারে, বুঝবে সেদিন
সপ্তসুরের মনবীণায়
বাজবে তারই জয় ॥

শিল্পী যদি ভাবে কভু
কেউ নেই তার তুল্য
সেদিন জেনো হারাবে সে তার মূল্য।

শিল্পী সে তো সবার মনের,
দুঃখে-সুখে সকল মনের,
সৃষ্টির মাঝে রইবে যে তার
সকল পরিচয়॥

(৪৯)

আমি যখন বসেছিলাম
নদীর কূলের কাছে,
(দেখি) তোমার কথায় এ-মন আমার
মগ্ন হয়ে আছে।

তখন যদি তোমার পেতাম দেখা,
লাগ্‌তো না আর আমার একা একা।
সাঁজের বেলায়
মৃদু হাওয়ায়
কত ছবি এঁকেছিলাম
এ-মন তোমায় যাচে॥

(তখন) তোমার সুরে গাওয়া সে গানখানি,
নতুন করে দিচ্ছিল সুর আনি ;
এমন সময়
তোমায় পেলে
কি যে ভাল লাগতো ওগো
বোঝাই কাহার কাছে॥

(৫০)

তুমি কেঁদোনা ওগো কেঁদোনা,—
ভুল বুঝে যেন অকারণে ব্যথা সেধোনা।

অনেক সুদূরে তুমি আজ চলে গেছো,
অজানা বাঁধনে আমাকে যে বেঁধে গেছো ;
যখনই তোমায় মনে পড়ে ওগো
মনে হয় বলি, আর স্মৃতি ডোরে বেঁধোনা।

অনেক আশাই আমার হৃদয়ে ছিল যে,
নিরাশার ঝড় সবই আজ কেড়ে নিল যে ;
সামান্য ভুল বোঝাবুঝি ভেঙে কাছে এসো
ক্ষণিক আলোয় আর বেঁধোনা

(৫১)

ঝুমঝুম্ ঝুমঝুম্ মল বাজায়ে
কোন্ পথে চলো তুমি
মন সাজায়ে ?

আমার এ-মন বাঁধা
তোমার কাছে,
ছাড়াবো কি করে বলো
কি আমার আছে ?
কার সাজা এ!

পায়ে-পায়ে চলি তাই সাঁঝ সকালে,
কি জানি কি লেখা আছে মোর কপালে।

এ মন সাঁঝের বেলা
কেমন করে,
পাই যদি কভু কাছে
পথের পরে,
মুখ লাজায়ে॥

(৫২)

গানে গানে আমি
তোমার যে সাড়া পেয়েছি।
তুমি তো আমার চিরজীবনের
তোমাকেই পাশে চেয়েছি

রইবে না মোর কিছুই তো আর,
দিনে যাব প্রেম আশা নিরাশার,
কেটে যাবে দিন
গান গেয়ে মোর
তোমায় যখন পেয়েছি।

জানিনা আমায় তোমার
কেমন লাগে,
আমাকে পাওয়ার আশা
জাগে কিনা জাগে!

কভু দ্বিধা আসে মনে,
যদি ভোলো কোন ক্ষণে,
কি হবে সেদিন
থেমে যাবে বীণ
মনে হবে মিছে গেয়েছি ॥

(৫৩)

গভীর নিশীথে উঠে দেখি
তুমি নেই !
যেমন করেগো চাঁদ ডুবে গেছে
আকাশেই ।

তবে কি স্বপ্নে ছিলে তুমি এতো কাছে,
ব্যথার স্মৃতিই তার শুধু ভরে আছে ।

মনের পাতায় তাইতো এ-মন
কথা লিখে চলেছেই ।

জানিনা তোমায় কবে চোখ চেয়ে দেখবো—
তোমাকে আমার মনের কথাটি লিখবো ।

এতো কাছে থেকে কেন দূর হয়ে রও,
তুমি আলো ওগো, আলেয়া তুমিতো নও !
আলোর মতই সত্যি হও গো
আঁধার দূরে ঠেলেই ॥

(৫৪)

আমার জীবনে তুমি আজ শুধু
পটে আঁকা ছবি নও —
তোমার মনের কাছেই ওগো
আরো কাছে ডেকে লও।

তোমাকে পেয়ে আমার জীবন
ধন্য হবে সে নদীর মতন।
সারানিশি জাগি কানে-কানে ওগো
একান্তে কথা কও।

তোমার প্রেমের পরশ পেয়ে,
আমার হৃদয় উঠবে গেয়ে,
ঊসর জীবনে আমার তুমি গো —
বরষার মেঘ হও।

(৫৫)

যাবার বেলায় অমন করে
আমায় পিছু ডেকো না —
বিদায়ের আগে শুধু বলে যাই
স্মৃতিও মনেতে রেখোনা।

দু'-চোখ কেন ভরিয়ে দিলে বিদায়ের সেই গানে?
যে গান শুনে পলক হারাই চেয়ে মুখের পানে,
দূরে যাও, কাছে থেকোনা॥

যাবার বেলায় মনে হয় কিছু হয়নি বলা।
এবার তোমার শান্তি, আমার শুধুই জ্বালা॥

সাঁঝের বেলায় তোমার মনে ভরবে দীপের আলো,
আমার একলা ভাঙা ঘরে ভরবে ব্যথার কালো,
আঁখিজলে মুখ ঢেকো না ॥

(৫৬)

তুমি নাই মোর ঘরে
সেই ব্যথা প্রহরে-প্রহরে
বয়ে চলি আমি।

এ হৃদয় শূন্য আমার,
এ জীবন রিক্ত পাথার,
কতদিন এ ভাবে কাটাবো জানিনা
কত দিন যামি।

বুঝিতে পারিনি তোমার সে মায়া,
বুঝিতে পারিনি কি ছিল সে চাওয়া।

আজকে সকল দ্বিধার শেষে—
বড় একা হয়ে দাঁড়িয়েছি এসে ;
কি করে বোঝাবো আমি ছিনু শুধু
তোমার অনুগামী॥

(৫৭)

ভোরের ঐ রঙীন পাখী
কেন যে ঘুম ভাঙিয়ে যায়—
ধরা দিয়ে সে কেন আবার লুকায়

সে কেন ডাকে ঈশারায়—
বলে সে, আঁধার ঠেলে আলোর পথে আয়
সে কি গো আশা পাখী গভীর নিরাশায় ?

সে কেন আজ সুর কাকলি গায় ?
বলে সে, ডুব দিয়ে যা সুরের ঝরণায়।
সে কি গো গানের পাখী মনের সীমানায় ॥

(৫৮)

আকাশে মেঘ জমেছে
মরানদী ঢেউ তুলেছে,
আমার এ-মন তরীর পালের
বাঁধন খুলেছে ॥

যখন খুশীর দোলায় দোলায় ঐ তীরে,
ভুলে গেলাম অনেক চেনা পথটিরে,
দেখি এ-মন হারিয়ে গিয়ে
সব সে ভুলেছে ॥

ভাবতে গিয়ে মজা লাগে ছিল না এ জানা,
এ যে দেখি আমার প্রিয়ার গাঁয়ের সীমানা !

মনের কোণের মেঘ যেন তাই ঐ সরে,
আমরা এখন বেড়াবো দু'হাত ধরে।
ঐ ঝড় তুফানের দোলায় যে আজ
মন যে দুলেছে ॥

(৫৯)

যেদিন তুমি চলে গেলে ওগো
আমায় একলা করে,
সেদিন হতে আর দীপ জ্বলে না গো
আমার শূন্য ঘরে।

তোমাকে পাওয়ার স্মৃতিটুকু আজো
আমার হৃদয় ভরে
নয়নের জলে রেখেছি সিক্ত করে।
কোনদিন যদি ফিরে আসো, দেখো, যদি কভু মনে পড়ে।

তুমি চলে যাওয়া
সেই ক্ষয়ে যাওয়া তৃণে,
শিশির ঝরেছে, যদি আসো পথ চিনে।
সে পথে ঝরানো বকুলের মালা গেঁথে রাখি তব তরে॥

(৬০)

আজও কি তোমার মনে আছে
সেই মন দেয়া-নেয়া কথা?
আঁধারে একেলা
শুধু ভাবি তাই, চারিদিকে নীরবতা॥

সেই স্মৃতি আজও মনে
দোলা দিয়ে যায়,
তোমায় পাবার আশা ক্ষীণ হতে-হতে
সুদূরে বিলীনপ্রায়—
তোমার মনেও এমন করে কি জাগে কোন আকুলতা॥

জানিনা গো তুমি কতদূরে আছ।
জানিনা আমায় কত ভুলে গেছো!
যাই ভাবো তুমি
আমি ভেবে পাইনা গো,
ভুল্‌তে তোমায় পারি না সহজে
যতদূরে যাই না গো
ভুল্‌তে তোমায় যতই চেয়েছি বেড়ে গেছে ব্যাকুলতা ॥

(৬১)

আকাশের তারা দেখে
বুঝতে পারিনি—
ভোর হতে কত দেরী
বুঝতে পারিনি।

যখন আমি বসেছিলাম বাতায়নের ধারে —
যেন, ভোরের রঙীন পাখী ডাকলো আমারে—
সে কি তবে বুঝেছিল তাকে আমি চিনি ?

সারারাত যাকে ভাবি তাকে পাই কৈ ?
অধরা সে ধরা দেয় ঐ পাখী ঐ !

বলে যা বলে যা পাখী পাবো কিগো তারে ?
তোরই মত কালো আঁখি মন দিনু যারে
সে খবর দিয়ে মোরে করে যারে ঋণী।

(৬২)

এই পৃথিবীতে শিল্পীর আজ
দামতো দেয় না কেহ।
শিল্পী সে কেন একা একা
হাসি গান খেলাতেও?

শিল্পীর মনে কি ব্যথা লুকানো
বুঝতো যদি গো কেউ;
দেখতো শুধুই সে সাগরে দোলে
আশা-নিরাশার ঢেউ:
সকলের মনে সুর ঢেলে তার
ক্ষত মাখা সারা দেহ॥

কত অন্তরে আনন্দ দিয়ে
ভাঙা কণ্ঠকে নিয়ে,
ধুপের মত রিক্ত সে হয়
সৌরভ বিলিয়ে।
কেউ তো বোঝেনা এই ধরণীর
আলো হাওয়া চায় সেও॥

(৬৩)

তুমি হঠাৎ আসায়
আমার মনে হল
মেঘ না জমেই
বৃষ্টি হয়ে গেল।

ভাবিইনিগো আস্‌বে এমন করে,
ডাকবে আমায় সেই চেনা নাম ধরে,
যেন, মরা নদী জোয়ার টলমল॥

প্রেমের জোয়ার আসেই জানি
জীবনে একবার—
তাই দুটি মন ছুটে যাবে
কাছেই মোহানার॥

কিসের আশায় মন যে কেমন করে
বোঝো না গো আমার এ অন্তরে
দুটি হৃদয় তাই কি ব্যাকুল হলো ?

(৬৪)

জীবনে মরণে আমি
তোমারই হ'তে চাই।
সে কথা কেমনে বলো
তোমাকে ওগো জানাই।

সে কথা জানাতে গিয়ে ফিরে ফিরে এসেছি,
দূর থেকে শুভ যেন কি ভাল যে বেসেছি,
জানিনা তোমার মনে পেয়েছি কি ঠাঁই॥

হৃদয়ের ভালবাসা এ যে কি জ্বালা,
দেবো-দেবো করে' শেষে শুকায় যে মালা।

এ যেন পিঞ্জরে বাঁধা বনের পাখী,
নীল আকাশের পানে শুধু চেয়ে থাকি,
কি করে বোঝাবো নীলে উড়ে যেতে চাই ॥

(৬৫)

তোমার গানের শেষকলি
আজ, আমার মনে নেই ;
তাইতো সে গান
গাইতে পারিনা অমন সহজেই

চৈত্রমাসের ঝরাপাতার,
কান্না জাগায় সে হাহাকার,
তবুও সে হায় দেয় না ধরা
আকুল ব্যথাতেই ॥

তোমার আমার প্রথম কথা,
কথা তো নয় নীরবতা,
অনুভবের দোলায় প্রহর
বয়ে যেত সেই ॥

ধূলায় ভরা আজকে বীণা,
সুর অভাবে সুরহীনা,
মেঘলা আকাশ দেখে মনে
পড়বে কি গান সেই ॥

(৬৬)

বারে বারে আমি ওগো
তোমায় কাছে ডেকে,
পাইনি যে কোন সাড়া
ও মনের থেকে।

জানিনা আমার এতে কি যে অপরাধ,
মিটিল না কেন হায় এ মনের সাধ।
অবহেলা দিয়ে কেন
দিলে দূরে রেখে।

কোন অভিযোগ আমি জানাবোনা তবু,
তোমার পথের কাঁটা হবো নাগো কভু।

ভাগ্য বলেই তাকে মেনে নেবো আমি,
তোমার দেওয়া দুঃখের হবো অনুগামী।
তবু ভালবেসে যাবো
ব্যথা বুকে ঢেকে।

(৬৭)

আকাশে চাঁদের আলোয়
তারায়-তারায় কত কথা,
আমরা দূরের থেকে
দেখি কেবল নীরবতা॥

ঝিকিমিক্ করে যেমন জোনাকীরা সন্ধ্যাবেলা,
কেউ কি জানে বলো কখন হবে তাদের সাঙ্গ খেলা?
কেনই বা এই মুখরতা!

তাই মনে হয় একটু আলো,
ন সেই তো ভালো॥

অন্ধকারে যেন পারি ঐ আলোতে চল্‌তে পথ,
চাওয়ার পথের গোলক ধাঁধায় হারাই না যেন মনোরথ
বুঝবে কে এই আকুলতা!

(৬৮)

আমার স্বপ্ন সফল হবে কি?
জানিনা!
তোমার পাওয়ার লগ্ন হবে কি?
জানিনা!

একটুও যদি কিছু আমি দিয়ে থাকি,
তোমার দুচোখে কিছু স্বপন এঁকে রাখি,
সে ছবি কখনো সত্যি হবে কি?
জানিনা!
জানি, চাওয়ার মত চাইলে পাওয়া তা যায়!
দুটি চাওয়া যদি এক হয় মোহনায়।

তোমার চোখের আলোয় আমায় দেখে,
নিয়েছি তোমায় মনের নিবিড়ে ডেকে,
তবু কি ফাগুন রঙীন হবে না?
জানিনা॥

(৬৯)

আর কতদিন
একা-একা জেগে রবই
পাইনা ভেবে —
কোন্ পথ দিয়ে আবার তুমি
আমায় দেখা দেবে।

শূন্য হৃদয়, ঘর যে আঁধার কালো,
নেভা দীপ দেবে কবে যে আবার আলো।
ছিন্ন সে তারে বেঁধে জীবনবীণাটি মোর
আবার কবে যে তুলে' নেবে।

তোমার পদধ্বনি শুনে' ছুটে আসি—
দেখি মিছে হাওয়ায় যত,
ঝরাপাতা ছোটে রাশি রাশি।

সয়না প্রতীক্ষায় এই রিক্ত জীবন,
তুমি হারা এ জীবন ভাবিনি কখন।
কি দোষ করেছি আমি জানতে পারি গো যদি
একবার সে সুযোগ দেবে ?

(৭০)

তোমার গানের মূল্য
আমি কি দিয়ে দেব যে জানিনা
সে যে যায়না কখনো দেওয়া তবু
মন বলে, আমি মানিনা।

শুধু আমার হৃদয় জানতে চায়,

কি সে এমন দাম যা শোধ করা দায়।

তাই তো তোমার সমুখে আমাকে

ভুলেও আর আমি আনি না॥

কত কথা ভাবি তাই আনমনে—

মনের কি দাম নেই মনের কোণে।

যদি এই মন ঐ গানের মূল্যে মেপে দিই,

আর গানের মাঝেই আমি তোমাকেই কাছে টেনে নিই,

আমার মাঝেই ধন্য হবে গান

শুধু, তোমার গানের বাণী না॥

(৭১)

এই রাত আজ কত সুন্দর

জ্যোৎস্নায় চামেলীর গন্ধে,

মন তাই খুশী যে আনন্দে।

সারারাত তাই ঘুম আসে না

নেই কোন তুলনা এ রাতের,

কত কবিতা মনে পড়ে যে,

উপমা খুঁজে পাইনা তো এর।

মন যেন সাজাহান

আবেগে মমতাজের ঐ

ফুলরাশি বাঁধি মনিবন্ধে॥

ও আকাশ সেও জেগে রয়েছে
চাঁদ সেও ঘুম হারা নয়নে ;
বাতাসও সে ধীর-ধীর বইছে,
কত কথা আজ স্মৃতি চয়নে।
মনে হয় রাত যেন
উর্বসী হয়ে নাচে
চপলহরিণী চপল ছন্দে ॥

(৭২)

বিদায়ের আগে ওগো আমায় তুমি
আঁখি জলে পথ রোধ করো না,—
যাবার এবার ওগো সময় হল
ব্যথাভরা গান ওগো ধরো না !

তোমার সাথে আজ সাঙ্গ করেছি খেলা,
জীবনে নেমেছে ঐ দেখো শেষবেলা !
আমার রিক্ত মন বিষাদে ভরো না ॥

আমার গানের সুর তুমি মনে রেখো—
অবকাশ পেলে তুমি গান গেয়ে দেখো।

অনেক পেয়েছি আমি তোমার কাছে,
একটি জীবনে আর কি পাবার আছে !
ফুল হয়ে পথে যেন ঝরো না ॥

(৭৩)

আমারে কাঁদায়ে বলো
কি সুখ পেলে ?
সারাটি জীবন আমি সেই পথে চেয়ে রবো
যেই পথ ধরে চলে গেলে ॥

ভুলের ও বালুচরে আমি তো কভুও
বাসা বাঁধিনি ।

তাইতো তোমার যাওয়ায় আমি কাঁদিনি ।
আমি যে তোমায় ওগো ভালবেসেছিনু জেনো
আমার সারাটি মন ঢেলে ॥

আমার জীবনে তুমি বলেছিলে
হবে ধ্রুবতারা —
এখন করেছো দিশাহারা ।

সেই আলোকের পথে বলেছিলে
নিয়ে যাবে সাথে,
আমি তো চলেছি একা রাতে ।
যেদিন বুঝবে তুমি ভুল করছো ওগো
সেদিন না হয় ফিরে এলে ॥

(৭৪)

কবে তুমি চলে গেছো এ ধরার থেকে ;
যত কথা দিয়ে গেছো বুকভরে রেখে—
ভুলি নাই সে তো ভুলি নাই—
শুধু তুমি নাই যতদূরে চোখ মেলে চাই ।

কত আশা ছিল শুধু দুজনার,
কত হাসি গান ছিল গাহিবার,—
আজ সব মরুময় ধু-ধু জলনাই ॥

দখিনা পবন সেও খোলে নাকো দ্বার,
ফুল সেও গন্ধ বিলায় না আর।

পাখীও ভুলেছে সুর বেদনা লয়ে,
আমি যেন স্মৃতির সে শবরী হয়ে
তোমার দেওয়া সে ব্যথা বুকে বয়ে যাই ॥

(৭৫)

আমার জীবনই বয়ে দেবে
এক বাণী—
আগামী পৃথিবী, শুনেছো কি তার
একটুও কানাকানি ?

সবার উপরে মানুষের স্থান,
উঁচু নীচু নেই, সবাই সমান।
সকলের তরে সকলে সদাই
এইটুকু যেন জানি।

জীবন বীণার সুরগুলি শুনে রাখো —
আশা হারা প্রাণে সুর দিতে ভুলো নাকো !

এই পৃথিবীতে সবাই আমার,
সুখের সঙ্গী, দুখেও আবার,
হাসলে হাসবো মরলে মরবো
এইটুকু যেন জানি।

(৭৬)

অনেক আশা নিয়ে সেদিন—
গিয়েছিলেম তোমার দ্বারে
এলাম ফিরে সেই ক্ষণেতেই
তোমার দেখা পেলাম নারে।

কিসের দোষে এত কাছের থেকে
বারেক আমায় আলোতে না ডেকে
ঠেলে দিলে দূরের অন্ধকারে॥

সেই অদেখার ব্যথা আমায় প্রহরে প্রহরে
ঘা দিয়েছে গভীর থেকে গভীর অন্তরে।

তাই তো আমি পথ হারিয়ে শেষে
কোন অসীমে দাঁড়িয়েছি আজ এসে
সুর থেমেছে হৃদয়-বীণার তারে

(৭৭)

এ জীবনে যৌবন যখনই আসে
দুটি আঁখি ভরে কত স্বপ্ন ভাসে,
হৃদয় উতলা হয়—প্রেমের আভাষে

কত রং ঝরে শুধু সারাবেলা—
মন জুড়ে প্রজাপতি করে শুধু খেলা।
ভ্রমরের গুন্ গুন্
বয়ে আনে ফাল্গুন
রামধনু রং আঁকে হৃদয়-আকাশে।

ফুলের সুবাস ভরে বাতাসে-বাতাসে
মন হয় দিশেহারা খুশী উচ্ছ্বাসে।

সে যেনরে উন্মনা মেঘের ভেলা—
শিমূলে পলাশে তাই রঙের মেলা।
দেয় দোল দেয় দোল
সবুজে হিল্লোল—
হৃদয়ে আগুন জ্বলে এ মধুমাসে ॥*

(৭৮)

কতনা দিনের পরে দু'জনায় দেখা হল
ইছামতী নদীটির নিরালা তীরে,
তখন ক্লান্তরবি চলেছে অস্তাচলে
পাখীরা চলেছে ফিরে যে যার নীড়ে ॥

হৃদয়ের কতসুর বেজেছিল সেইক্ষণে
নদীর ঢেউয়ে –
কাঁঠালি চাঁপার বন গন্ধে বিভোর হল
হৃদয় ছুঁয়ে
পলক হারা চোখ আর নীরব মুখটি দেখে
কত স্মৃতি জেগেছিল হৃদয় ঘিরে।

কিছুপরে চেয়ে দেখি চাঁদ উঠি উঠি
তখন আমরা ছাড়া সবার ছুটি

দুটি প্রাণ, দুটি মন তখন মুখর হল
চাঁদের আলোয়—
চোখে চোখে আগেকার না-বলা কথারা যেন
জীবন্ত হয়।
বেঁকে যাওয়া দুটি পথ কখন যে মিলে গেল
মনে হল সেই পথে চলেছি ধীরে ॥

(৭৯)

আমি যখন থাকব না গো
তোমার পৃথিবীতে,
হয়ত নতুন তুল্‌বে গো সুর
স্মৃতির বীণাটিতে ॥

জান্‌তে বড় ইচ্ছে হয় গো তখন কেমন করে,
কাট্‌বে তোমার সময়গুলো সারাটি দিন ধরে'
হয়ত ইচ্ছে করবে আমায় মনের থেকে
মুছে ফেলে দিতে ॥

বুঝি আমার এসব কথা লাগ্‌ছে নাকো ভাল—
অভিমানে মুখখানি তাই হয়েছে আজ কালো।

সুখের দিনে দুখের কথা কেইবা ভাবে বলো ;
আঁধার পথে হাত ধরে আর কেইবা বলে, চলো ?
আধার তুমি ফাগুন শ্রাবণ এক করে
আজ আপন করে নিতে ॥

পল্লী গীতি

(১)

মন নেয়ে তোর বৈঠা তুলে নে,
জোয়ার এলো জীবন নদীতে—
যৌবন উচ্ছল নদী
কল্‌কলিয়ে ছুট্‌ছে গতীতে ॥

খুশীর বাদাম দে উড়িয়ে দে,
শক্ত মনের হাল ঘুরিয়ে নে,
তরতরিয়ে চলুক নৌকা
ময়ুর পঙ্খীর ভঙ্গিতে।

আস্‌লে তুফান হতাশারই ঝড়ে—
নাও যদি তোর ঘা খায় বালুচরে ;

অন্ধকারের ভাবনা দূরে ফেলে —
দাঁড় বেয়ে যা সব্‌কে অবহেলে—
আলোর দেশের হদিস পাবি
ছুটে চলার ইঙ্গিতে ॥

(২)

ওরে সুজন্‌রে, গহীন গাঙে নাও বাইয়া
যাওরে সে কোন দেশ—
ঘাটে আমি একাকিনী
মনে নাইরে সুখের লেশ !

আম—কাঁঠালের পিঁড়ি দিব বস্‌বে যতন করে,
ফলার দিব নোতুন ধানের পিঠা থরে থরে,
কালো গাইয়ের সর তোলা দুধ
দিব পাতের শেষ,
বারেক ভিড়াও নাওখানি গো
কইর‍্যা খানিক ক্লেশ ॥

কতনা দ্যাশ ঘুইরা সুজন্
পাবে নারীর মন ;
দ্যাখয়া নারী একটিও আর পাইবে না এমন।

যাবার সময় পানটি দিলাম বোঁটাটি রাঙা করে,
দূর দ্যাশেতে যাইয়া সুজন ভুলো নাকো মোরে,
ফিরবার পথে না আসতো
বাঁধবো না আর কেশ।
তিলে-তিলে শুকাইবে দেহ
ছিন্ন হবে বেস ॥

(৩)

সহেলীরে, আমারে কান্দায়ে কেন গেলা পরবাসে ;
যৌবন হইল জর জর দুরন্ত ফাগুন মাসে,

ডালিম গাছে ডালিম ফলে
রস থৈ থৈ করে,
আমার বুকে রসের ধারা
শুক্‌না হইয়া ঝরে।
কাছে থাকার কথা ভাবলে
চক্ষে পানি আসে ॥

সাঁঝের পিদিম জ্বাল্‌তে যাইয়া একটি কথাই বলি-
কেমন কইর‍্যা আছো সুদূর মনটি আমার দলি' !

নিশি পোহায় তারা গুইণ্যা
আকাশ পানে চাহিয়া,
শূন্য শয্যা দেইখ্যা পরান
উঠে আকুলিয়া,
মাথার কিরা রইল যদি
না পাই এবার পাশে ॥

(৪)

কখন জোয়ার কখন ভাটা
এই তো নদীর খেলা !
তাইতো স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম
সুখ-দুখের ভেলা ॥

জীবননদী বয়রে যখন এমনি জোয়ারে—
আমার ভেলা তখন বলো রুখতে কি কেউ পারে !
তখন দেখি সেই উজানে
শুধুই ঢেউএর মেলা ॥

আবার যখন নদীর মতন ভাটার সে দিন আসে,
ঝিলিক হারা সেই নয়নই তখন জলে ভাসে।

নদীর খেলা আজব রকম আপন খেয়ালে,
কখন থামায় কখন কাঁদায় কখন জড়ায় জালে।
একূল গড়ে পরক্ষণেই
ওকূল ভেঙে ফেলা ॥

(৫)

দেশে-দেশে কতই না ঘর
কোথাও আমি পেলাম না ঠাঁই
এই দুনিয়ায় ॥
পথের খাঁচায় বেঁধে আমায়
রাখলে কেন হায় ॥

নয়ন জলে ভাস্‌লো কেবল
মোর মনেরি কথা,
উদাস মনে কাঁদলো যে ভাই
আমার আকুলতা !
মন নিয়ে কেউ এলো না হায়—
মনের আঙ্গিনায় ॥

বৃষ্টির জল পেয়ে ফসল
শ্যামল হোল কত,
মরা নদী ঢেউ কূল কূল
ছুটলো অবিরত।
আমার জীবন দগ্ধ হলো
দারুণ হতাশায় ॥

(৬)

তুই শুধুরে বৃথাই আমায়
ডাকিস বারে বারে।
মন দেয়া আর মন নেয়াতো
কিছুই হোলনারে।

তোর কথারে শুধুই আমি,
ভাবি নিশি দিবস যামী,
কেমনে মোর ভিড়বে খেয়া
তোর ঐ মনের পারে।

আদরিনী গরবিনী সোহাগিনী তুই
এ ধন পেলে মনের ঘরে কোথায়রে বল্ থুই।

তাইতো আমি তোরই খোঁজে,
ঘরের বাইর হইলাম নিজে ;
বাউল হয়ে গাইবো রে গান
একতারাটির তারে।

(৭)

আমি, সাজ্‌লাম সাজ্‌লাম তবু
মনতো পাইলাম না ॥

তোমার মনের নাগাল খুঁজে সাগর দিলাম পাড়ি—
স্বপন, স্বঘর তোমার লাগি আস্‌লাম সবই ছাড়ি'।
আমি, কাঁদলাম কাঁদলাম তবু
মনতো পাইলাম না ॥

তোমার মনে সুখ আনিতে দুখ্‌কে করলাম সাথী,
তোমার খোঁজে দিবস গেল পোহাইলাম যে রাতি।
কত, সাধলাম সাধলাম তবু
মনতো পাইলাম না॥

তোমার হাতে ফুল দিতে গো ছাড়লাম জাতিকুল,
তবু তুমি কেমন কইর‍্যা বুঝ্‌লা আমার ভুল ?
হায়রে, সাজ্‌লাম সাজ্‌লাম তবু
মনতো পাইলাম না॥

রাগপ্রধান

(১)

স্মরণের বীণা রাতের আঁধারে কাঁদে।
যেন, পেয়ে হারানোর ব্যথা নিয়ে সুর বাঁধে

কে যেন কবে এ মনের দুয়ারে,
এসে-এসে ফিরে গেছে বারে বারে
আজ এ উদাস নিঝুম প্রহর ভরেছে সে অবসাদে ॥

দুটি আঁখি মোর রাত জাগা পাখী হয়ে,
সেই স্মৃতি ভার একাই চলেছে বয়ে।

কেউ যদি কভু এ মনের দ্বারে
ঘা দিয়ে-দিয়ে জাগায় আমারে
হয়ত দেখবো এ-মন সেদিন বসন্ত সুর সাধে ॥

(২)

ওগো, পরদেশী মেঘ, শুনে যাও মিনতি করি,
পরবাসে পিয়া মোর, ভুলে মোরে গিয়েছে সবি

ফুল ফুটে ঝরে যায়,
দিন রাত যে পোহায়,
শাওন-ভাদর গিয়ে ফাগুনের ঘাটে বাঁধা তরী ॥

সে কি তবে কথার কথাই দিয়ে গেছে,
আমার ফুলের মন মিথ্যা আশায় ভরে গেছে!

আর কত তার আশায়,
যাবে দিন ছলনায়,
বলো তারে, এ হৃদয় হয়ে গেছে পাষাণ শবরী॥

(৩)

রজনী যায় যায় সজনী এলো না,
তিয়াসী এ হিয়ার পিয়াসা গেল না!

শুকতারাটি নিবু-নিবু করে ঐ,
টুপ্ টুপ্ করে শিশির ঝরে ঐ,
রাত চরা পাখী সাথী কি পেলো না?

তন্দ্রাতুরা ঐ মাধবীলতা—
রাতের বুকে নেমেছে নীরবতা।

জ্বলে জ্বলে ঐ প্রদীপ যে নিভে গেল,
পথ চাওয়া তাই দু'নয়ন এলো মেলো
কেন এসে বলে না সে, 'আঁখি জল ফেলো না'॥

(৪)

নিঝুমরাতে কে ডেকে যায়—
প্রাণে, সুরের কাঁপন রেখে যায়!

সে সুর ডাকে বারে বারে,
এমন রাতের অন্ধকারে,
কিছুবা ভোলায়, কিছু থেকে যায়।

স্মরণের কোন কথা বুঝি
কেঁদে কেঁদে ফেরে তারে খুঁজি।

সে সুর যদি ধরা দিত,
রিক্ত এ মন ভরে নিত,
কিছু ব্যথা তবু ঢেকে যায়॥

(৫)

বীণা বেঁধেছি মেঘ মাল্লারে।
ঝর ঝর বর্ষন অন্ধকারে॥

গগনে বিদ্যুত চমকে—
গুরু গুরু বজ্রের চমকে—
বিদ্রুপ করে যেন স্তব্ধতারে॥

শন্‌শন্‌ বাতাসের অট্টহাসি;
শিহরন তোলে মনে নিত্য আসি।

সঘন বর্ষন প্রহরে—
মানে না যে মন একা ঘরে,
যদি কেউ ঘা দিত বন্ধদ্বারে॥

(৬)

ডাকে না কেন যে বাঁশি সেই রাধা নামে,
যমুনার কুলু কুলু কেন ঐ থামে।

বিহগ তুলেছে তার কাকলী—
কোথায় গিয়েছে শ্যাম সে ছলি
ছড়ানো স্মৃতিরা কাঁদে এ মধু ধামে॥

আকাশও সে কেঁদে বলে, 'কোথায় শ্যাম'!
মাটি বলে, 'কেন তারে হারালাম'!

কদম কুঞ্জ ঐ শূন্য পড়ে—
যায় না কেউ তো আর গাগরী ভরে
কোথা দূর্বাদল-শ্যাম শ্রীরাধা বামে॥

দেশাত্মবোধক

(১)

ওমা, তোমারই লাগিয়া জীবন বিলিয়ে

চলে গেল আজ যারা,

ভুলো নাগো যেন কভু তাহাদের চিরদিন মনে রেখো

তাদের সে কথা রক্ত লেখায়

লিখে রেখো যত মনের পাতায়—

শত-শত মন সেই প্রেরণায় ঢেকো ॥

তোমার মান ও সম্মান তরে,

সুখও শান্তি এনে দিতে ঘরে.

যে রক্ত ঝরলো,

তুমি অঙ্গে তা মেখো ॥

জন্মে তোমার কোলে ওগো যারা

ঐ, মরণ দিয়েছে ঢেলে,

ভুলো নাকো অবহেলে।

তাদের অশ্রু ও দুটি নয়নে

স্বপ্ন হয়ে মা থেকো ॥

(২)

এ দেশ আমার এদেশ তোমার,
স্বাধীন ভারত এ যে সবার।
কত না বীরের স্মৃতির প্রদীপ
জ্বল্‌ছে আজও মাটির পরে
তাঁদের সবাই স্মরণ করি
বরণ করি পুণ্যভরে
তাঁদের নিয়ে লিখি যে গান
ছড়াই সে গান সবার তরে॥

বীরের খুনে রাঙা হল
আমাদের এই পুণ্যভূমি ;
অসময়ে ঝরলো যে ফুল
এসো সবাই তাঁদের নমি।

সময় এলো মোদের এবার —
একই সাথে শপথ নেবার —
একই মায়ের দামাল ছেলে
আমরা সবাই মোদের যে যার ;
দেশের তরেই মরবো এবার॥

ভক্তিমূলক

(১)

ও দয়াল গুরু, উপায় বলো না—
শত ছিদ্র দেহতরী সামলাতে না পারি
এধার সারি ওধার দিয়ে ঢোকে যে জলকণা।

একে নদী ছলছল,
তায় তরী টলমল
ভরসা দাঁড়ে শক্ত হাতে দাঁড় টানা এক ছলনা!

তার পরেতে ষড়রিপু ঝড় তুফান না হয়ে,
হারিয়ে দিশা চোখ ধাঁধিয়ে গেল বিপথ লয়ে।

একে ওপার ভরা আঁধার,
তায় নদীর উথাল পাথার,
শুধু, তোমার নামে হাল ধরেছি ফাঁকি দেওয়া হোল না

(২)

ওগো নিঠুর দয়াময়,
আমায়, আঘাত দিয়ে ভেঙে-ভেঙে নতুন করে গড়ো
কঠিন তোমার শাসন দিয়ে মনের মত করো।

(যেন) সুখের মোহে অন্ধ হয়ে
তোমায় না ভুলে থাকি,
বুঝতে দিয়ো এদিন গেলে
দুখের দিনও বাকি,
(যেন) জীবন জোয়ার ভাঁটা
আছে আঁধার আলোর পরও ॥

ব্যাসনে বৈভবে আমায় মত্ত করে রেখে,
সরিয়ে যেন রেখো নাকো তোমার চরণ থেকে ।

(যেন) দিন যাপনের কঠিন বেড়ায়
বদ্ধ করে মোরে
অবাধ মুক্তি কেড়ে নিয়ে
বেঁধোনা পিঞ্জরে ।
(ঠিক) দিন-রাত্রির মতই জীবন
সমান এ মন তরো ॥

(৩)

নয়ন জুড়িয়া রহো শ্যাম গিরিধারী ।
মন বৃন্দাবনে এসো শ্রীরাধা প্যায়ারী ॥

তুমি ছাড়া জীবন আঁধার,
হে করুণা সিন্ধু অপার,
নবদূর্বাদল রূপী গোলক বিহারী ॥

কাঙ্গাল হৃদয়ে যে গো বিলম্ব সহেনা,
দগ্ধ মরু জীবন যেন, দখিণা বহে না ;
এসো যুগ যুগ ত্রাতা
অসীম প্রেম প্রীতি দাতা,
অশান্ত জীবনে করো সিঞ্চন শান্তি বারি ॥

(৪)

সবার চেয়ে মা যে আমার
ধরণীতে বড় ।
আর কেহ কি দিতে পারে
স্নেহ তেমন তরো !

যেদিন আমি জন্মেছিলাম,
মায়ের বুকের সুধা নিলাম,
মায়ের চরণ ছোঁয়ায়
মনে খুশী করি জড়ো ॥

মায়ের মুখে হাসি দিতে
চেয়েছিলাম আমি ;
তাইতো সদাই চির উদাস
দুঃখ অনুগামী ।

সেদিন আমি ধন্য হলাম
মায়ের মুখের হাসি পেলাম,
জীবন মরণ তুমি আমার
ওগো, এমনি আমি দড়ো ॥

(৫)

(শুনি) দীনবন্ধু, তোমার কৃপা
অনেক লোকের মুখে,
(তবে) আমার বেলায় কৃপণ কেন,
কাটাই যে দিন দুখে !

জানি নাকো ধরম করম,
পাপী আমি যে নরাধম,
(ঐ) নিয়মকানুন জানিনা গো
বিবেক নেই মোর বুকে॥

যুগে যুগে জীবে তরাও তুমি অন্তর্যামী ;
(বারেক) অমৃতলোক হতে এসো
মনের কোণে নামি ॥

তোমার কৃপাবিন্দু পেলে,
ডরাই না দুখ কাছে এলে,
(তোমার) কৃপাসিন্ধু পূর্ণ রবে
বাঁচবে এ দিন সুখে ॥

(৬)

জবা পেলে তুই খুশী হোস মাগো
এই তো আসছি জেনে,
রক্তের জবা যদি দিই পায়
বল্ বুকে নিবি টেনে ?

জানিনা কি করে কোন্ হিসেবেতে,
আরাধনা করে পারি তোরে পেতে,
অশান্তিময় জীবনই কাটবে
মন নিয়েছে তা মেনে ॥

এক জীবনের সাধনায় নাকি
পায় নাকো তোরে কেহ !
তুই নাকি মাগো, কুহেলী অধরা
ভেবে অবস এই দেহ।

কঠিন আঘাতে ভেঙে-ভেঙে মোরে,
গড়ে দে গো তোর মন মত করে,
সুখ শান্তির ছোঁয়া দেনা মাগো
পাপ তাপ দূরে হেনে ॥

সূচীপত্র (গীতি গুচ্ছ)

গানের শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ক্রমিক সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩	১	২	চাহেনা	চায়না
৭৩	১	১১	বেদনা	বেদনায়
৮৭	১৯	১৬	?	।
৯২	২৫	৫	পেরে	পেয়ে
৯৫	২৯	১০	তোমার	তোমায়
৯৫	৩০	১	রাঙানো	রাঙালো
৯৬	৩১	৮	তরীটি	তীরটি
৯৯	৩৬	৭	গুঞ্জর	গুঞ্জন
১০৪	৪৩	৫	তাল	শাল
১০৯	৪৮	১৪	মনের	জনের
১০৯	৪৯	১০	এ-মন	এ-ক্ষণ
১১০	৫১	১	ঝুমঝুম(১)রুমঝুম	রুমঝুম
১১১	৫২	৬	দিনে	দিয়ে
১১২	৫৩	৬	তার	ভার
১১৩	৫৫	৯	জ্বালা	জ্বলা
১১৮	৬২	৩	একা একা	একা একা রয়
১২২	৬৭	৯	ন	এই জীবনে
১২৯	৭৭	১৪	সবুজে	সবুজের
১৩৫	৭	৪	স্বপন	স্বজন
১৩০	৭৯	১৩	আধার	পারবে
১৩১	২	১৩	ছাথয়া	ছাথ্বা
১৩২	২	১৪	বোঁটাটি	ঠোঁটটি
১৩৬	৭	১২	আমার	আমায়
১৩৭	২	২	সবি	সরি
১৩৯	৫	৪	চমকে	গমকে
১৪০	৬	৬	কোথায়	কোথা

১৪২ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তির পর—দেশের তরে জন্ম যখন